বিদ্রোহী উত্তরবঙ্গ : আন্দোলনের পথ ও প্রাপ্তি

প্রফেসর ড. মোঃ ইলিয়াছ প্রামানিক

১৯৭১ থেকে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামে উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অসামান্য অবদান ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে। শহীদ শঙ্কু সমজদার থেকে শহীদ আবু সাঈদ-এই দীর্ঘ যাত্রাপথে উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের আত্মত্যাগ আমাদের জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের শিখাকে প্রজ্বলিত করেছে এবং তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রতিটি কোণে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চের সেই ঘটনাটি আজও জ্বলজ্বল করছে আমাদের স্মৃতিতে। কৈলাশ রঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, ১২ বছরের কিশোর শঙ্কু সমজদার, বড় ভাইয়ের হাত ধরে মিছিলে গিয়েছিলেন রংপুরের রাজপথে। সেই মিছিলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি শহীদ হন। শঙ্কুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে রংপুরের জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেই দিনেই অবাঙ্গালির গুলিতে রংপুর কলেজের ছাত্র আবুল কালাম আজাদ এবং জনতা ওমর আলীও শহীদ হন। এই তিন শহীদের আত্মত্যাগ সারা দেশে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, যা ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণেও উচ্চারিত হয়েছিল।

শহীদ শঙ্কু সমজদারের মতোই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রথম শহীদ আবু সাঈদ, তার আত্মত্যাগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন এক গণঅভ্যুত্থানে রুপান্তরিত করে। রংপুরের ৩০ জন সাধারণ ছাত্র, আবু সাঈদ, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সেই দীর্ঘ সংগ্রমী ধারার প্রতিফলন, যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি ছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক অকুতোভয় সংগ্রামী, যার নেতৃত্ব ও সাহসিকতা তার সহপাঠীদের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। আন্দোলনের শুরুতে শিক্ষার্থীরা বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করছিল। আবু সাঈদ ছিলেন সেই মিছিলের অগ্রভাগে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত। আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আবু সাঈদের এই নির্মম মৃত্যুর খবর মুহূর্তেই রংপুরসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সারা দেশের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের দাবি আরও জোরালোভাবে তুলে ধরে। এই আন্দোলনের উত্তাপে উত্তারঞ্চলের আরও দশ জন শিক্ষার্থী ও সারা দেশের শত শত ছাত্র জনতা শহীন হন, যারা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করেন। " জেনারেশন জেড ও অভ্যুত্থান" সম্পর্কিত বইয়ে এ তথ্য সংক্রান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

আবু সাঈদ এবং অন্যান্য শহীদদের এই আত্মত্যাগ শুধু একটি আন্দোলনের সফলতা এনে দেয়নি, বরং এটি দেশের মানুষকে একটি নতুন স্বপ্ন দেখার সাহস দিয়েছে। ঠিক যেমন ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে শহীদ শঙ্কু সমজদারের আত্মত্যাগ মুক্তিযুদ্ধের শিখাকে প্রজ্বলিত করেছিল, তেমনি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে আবু সাঈদের আত্মত্যাগ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা যোগায়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছিল উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি যুগান্তকারী অধ্যায়, যেখানে তারা প্রমাণ করেছে যে তাদের রক্তেইবহমান সংগ্রামের ঐতিহ্য। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যে সাহসিকতা দেখিয়েছে, তা উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংগ্রামের মতোই অনবদ্য। আবু সাঈদের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা কেবল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি, তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে এই আন্দোলনকে এক ঐতিহাসিক মোড়ে নিয়ে গেছে।

শিক্ষার্থীদের এই গণঅভ্যুত্থানের ফলস্বরুপ দেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে রয়েছেন নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে শিক্ষার্থীদের বিপ্লবী সরকার দেশ পরিচালনা করলেও উত্তরাঞ্চলের জনগণ প্রত্যাশিত সুফল থেকে অনেকটাই বঞ্চিত রয়ে গেছে। আবু সাঈদের শহর রংপুর আজও উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধারায় প্রবেশ করতে পারেনি।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আবু সাঈদ তার রক্ত দিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, সেই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আজও সমতার সোপানে পৌঁছাতে পারেনি। উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধার বিচারে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজন অনেক বড় অংকের বরাদ্দ। বিগত দিনগুলিতে যথেষ্ট বরাদ্দের অভাবে কাঙ্ক্ষিত পরিসরে সম্প্রসারিত হয়নি একাডেমিক ভবন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিংবা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। কিছু প্রকল্প পরিকল্পনার আওতায় থাকলেও বাস্তবায়নের গতিশীলতা এতটাই ধীর যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা সঞ্চারিত হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের মানুষ তাদের প্রাপ্য উন্নয়ন দেখে যেতে চায়, তারা কেবল পরিকল্পনার খসড়ায় আটকে থাকতে চায় না।

উত্তরাঞ্চলের তিস্তাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার আন্দোলন এখনও চলমান। নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের পাশাপাশি বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের দাবি উঠেছে। কিন্তু এই আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে, সে প্রশ্নের উত্তর আজও অনিশ্চিত। যে তিস্তা কেবল একটি নদী নয়, বরং উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক শিরদাঁড়া, তা আজও পরিকল্পনার গণ্ডিতে আবদ্ধ। রংপুরের সিটি কর্পোরেশন, যে শহর এক সময় বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, আজ উন্নয়ন বরাদ্দের তালিকায় প্রায় শূন্য অবস্থানে পড়ে আছে। জাতীয় বাজেটে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই নগরীকে যেন সচেতনভাবেই উপেক্ষা করা হয়েছে। বিপ্লবের পরও পরিবর্তনের সেই প্রতিশ্রুতির আলো এখানকার আকাশে যেন পুরোপুরি উদিত হয়নি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, রংপুর হবে আবু সাঈদের শহর, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন হবে এই অঞ্চলের। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত ইঙ্গিত দেয়। প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তব চিত্রের ব্যবধান দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর যেভাবে এই অঞ্চল অবহেলার শিকার হয়েছিল, ঠিক তেমনি জুলাই বিপ্লবের পরও উত্তরাঞ্চলের মানুষ সেই একই বঞ্চনার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু ইতিহাস বলে, এই জনপদ কখনো নতি স্বীকার করেনি। তারা জানে আন্দোলন এখনো শেষ হয়নি, রক্তের ঋণ পরিশোধ হয়নি। উন্নয়নের আশায়, ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা বারবার ইতিহাস গড়েছে, আবারও গড়বে।

প্রফেসর ড. ইলিয়াছ প্রামানিক

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

(লেখাটি গত ১৫-০৩-২০২৫ তারিখ (পৃষ্ঠা-২৩) তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এ প্রকাশিত হয়েছে।)

সাঈদ, আপনিই আমাদের জোহা স্যার!

কাজল রশীদ শাহীন*

আবু সাঈদ, মারা যাওয়ার আগে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন জোহা স্যারের অভাব। কায়মনে চেয়েছিলেন উনার উপস্থিতি। মৃত্যুর আগের দিন ফেসবুক পেজে লিখেছিলেন, 'স্যার! এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার স্যার।'

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবি এই ছাত্র মৃত্যুর আগে হন্যি হয়ে তালাশ করেছিলেন একজন শামসুজ্জোহাকে, কেন? কারণ, উনার প্রত্যাশা ছিল, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে কেউ একজন রচনা করবেন নতুন ইতিহাস। হয়ে উঠবে এই সময়ের জোহা স্যার! আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো যাবে না, যদি চালানো হয়, তা হবে আমার রক্তের ওপর দিয়ে।

'৬৯-র অভ্যূত্থানের সময়' যেমনটা বলেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক প্রক্টর মুহম্মদ শামসুজ্জোহা।

কাঙ্খিক্ষত একজন স্যারের দেখা পাওয়ার জন্য আবু সাঈদ আপনি-আপনারা অধীর আগ্রহে পার করেছেন একটা পক্ষ। কী কষ্টের সেই দিনগুলো! প্রতীক্ষার একটা পক্ষ হয়েছে এক বছরের চেয়েও দীর্ঘ, কিংবা তারও অধিক। তারপরও, অপেক্ষা করেছেন, প্রতীক্ষার প্রহর গুণেছেন, এক বুক আশা নিয়ে।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন! তাই, একসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন নিজের আকুতি। মেলে ধরেছেন আকাঙ্গা ও প্রত্যাশার বারতা।

কিন্তু না, সেই স্ট্যাটাসেও সাড়া মেলেনি কারও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, দেখা মেলেনি সাঈদের-ছাত্রদের আকাঙিক্ষত শামসুজ্জোহা স্যারের। কোনো শিক্ষক, লেখক, কবি ও সাহিত্যিক কেউই ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। এই অভাববোধ, খেদ থেকেই সাঈদ যেন নিজেই হয়ে উঠলেন একজন শামসুজ্জোহা। রচনা করলেন অমর এক ইতিহাস। যে ইতিহাস আমাদের স্মরণ করাবে ৯০, ৮৭, ৭১, ৬৯ এবং ৫২-র রক্তঝরা দিনগুলোর মতো ২০২৪ কেও।

মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সাঈদ থাকবেন অনুপ্রেরণার দীপশিখা হিসেবে। কেবল বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর যে প্রান্তে ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া ও অধিকারের প্রসঙ্গ হাজির হবে, সেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারিত আবু সাঈদের নাম।

শামুসুজ্জোহা স্যারকে সাঈদ যেহেতু গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন, এ কারণে উনার জানা ছিল নিশ্চয় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের কথা। ডায়ারের নির্মম-নির্দয় গুলিবর্ষণে হতাহতের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যাখান করেছিলেন ব্রিটিশের দেওয়া নাইটহুড উপাধি। সাঈদের আত্মাহুতির সাহস দেখে ইতিহাস সচেতন সকলেরই মনে পড়বে নিশ্চয় ক্ষুদিরামের কথা।

সাঈদ, আমাদের বিশ্বাস, আপনার ও আপনাদের মতো ছাত্রদের ভেতরেই বেঁচে থাকেন একজন নূর হোসেন, একজন রুমি, একজন আসাদ, একজন রফিক-শফিক-বরকত ও জব্বারের মতো অগণন সব সাহসী প্রাণ। যারা জীবন বিসর্জন দেন দেশপ্রেম থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যায় ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায়। যাদের চাওয়া ছিল কেবল একটাই-মানুষের মুক্তি-স্বস্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

---

* কাজল রশীদ শাহীন, চিন্তক, সাংবাদিক ও গবেষক।

যেমনটা চেয়েছিলেন আপনি ও আপনারা। যার নাম কোটা সংস্কার। কারণ, কোটার নামে সরকারি চাকরির অর্ধেকেরও বেশি দখলে নিয়েছিল অন্যায় অপকর্মের হোতারা।

বেশিরভাগ কোটা যে লক্ষ্যের জন্য রাখা হয়েছিল, তা তো বাস্তবায়ন হচ্ছিলই না, উপরন্তু সেসবে বাসা বেঁধেছিল সকল প্রকারের ধান্ধা-ফিকির আর দুর্নীতির আগাপাছতলা। কোটার ৩০ ভাগ বরাদ্দ ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য। এসব যে স্বচ্ছভাবে হচ্ছিল না, তার বড় প্রমাণ সনদধারী ৬২ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতি। অন্যের সন্তানকে নিজের পরিচয় দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের কোটায় চাকরি নেওয়ার মতো অপরাধ।

এসব গুরুতর অন্যায়-অপকর্মের অবসান চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। এ জন্যই নেমে ছিলেন কোটা সংস্কার আন্দোলন। চাকরির বাজারের এই হাহাকারের দিনে, যেখানে এক কোটি ৮০ লাখ বেকার ধুঁকছে চাকরির অভাবে, যেখানে মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে করে তুলেছে সঙ্গিন ও জীবন্মৃত, যেখানে শাসক ও প্রশাসকরা কেবলই স্বার্থ দেখছে উপরমহল ও নিজ বৃত্তের ঘেরাটোপে- সেখানে কোটা সংস্কার চাওয়া কি অন্যায় কিছু? মানুষ কি বেঁচে থাকার জন্য শেষ অধিকার হিসেবে এটুকুও চাইতে পারবে না?

সাঈদ ও তার সতীর্থদের চাওয়া ছিল একেবারে যৎসামান্য। সেখানেও যখন তারা হতমান হয়েছেন, নির্দয় নিষ্পেষণের শিকার হয়েছে, তকমা পেয়েছে বিশেষ বিশেষ শব্দের; বিপরীতে অবিশ্বাস্যভাবে পাশে পায়নি কাউকেই; তখনই সাঈদ মনের ভেতরের আকাঙ্গাটাকে, একজন জোহা স্যারের প্রত্যাশাকে লিখে দিয়েছেন ফেসবুকের পাতায়।

তারপর, এক বুক বেদনা ও হাহাকার নিয়ে দেখেছেন, এ সময় কেউ হতে চান না একজন শামসুজ্জোহা। কারণ, আখের গোছানোর সুবর্ণসময় এখনই বুঝি বয়ে যায়!

কেন সাঈদ একজন শামসুজ্জোহাকে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন? কারণ তিনি জানতেন শামসুজ্জোহারা ন্যায় ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শক্তি যোগায়। যেমনটা করেছিলেন ১৯৬৯-এ। শেখ মুজিব তখনও বঙ্গবন্ধু না হলেও বাঙালির, সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। সবার চাওয়া হয়ে উঠেছিল একটাই, 'জেলের তালা ভাঙ্গবো শেখ মুজিবকে আনবো'।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামি তিনি। এই মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ৬৯-র শুরুতেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পুরো দেশ। ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্রনেতা আসাদ। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবিতে গড়ে তোলে দুর্বার এক গণ-আন্দোলন। মুহূর্তেই আইয়ুব গেটের নাম বদলে রাখা হয় 'আসাদ গেট'।

আন্দোলন পরিণত হয় গণসংগ্রামে। ইতিহাসে এরকম গণঅভ্যুত্থানের কথা শোনা যায় চৈতন্যর সময়ে। সেই আন্দোলন সংগ্রামে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছিল ঘরে ঘরে 'অরন্ধন' কর্মসূচি পালনের মধ্যে দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের কালেও পালিত হয়েছিল এরকম এক 'অরন্ধন' প্রতিবাদ।

১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হলে নিহত হয় মতিউরসহ আরও কয়েকজন ছাত্র। ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর নিহত হন তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক। এই অবস্থায় আন্দোলন হয়ে ওঠে লক্ষ্যভেদী। ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে নৃশংসভাবে দমন-পীড়ন ও ছাত্র-জনতাকে নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদ লেখক-কবি-সাহিত্যিকেরা ফিরিয়ে দিতে থাকেন পাকিস্তান সরকারের দেওয়া সিতারা-ই-

ইমতিয়াজসহ অন্যান্য পুরস্কার। ১৭ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন চলাকালে পুলিশি হামলায় আহত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভরত ছাত্ররা।

বাংলাপিডিয়ায় এ সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে, 'পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্থানীয় প্রশাসন ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কে ১৪৪ ধারা জারি করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সামরিক বাঁধা উপেক্ষা করে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ড. জোহা অকুস্থলে ছুটে যান এবং উত্তেজিত ডরমিটরিতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালান। তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি না চালানোর অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করে সেনাবাহিনী মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে এবং ড. জোহা গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে ড. জোহা তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আমি বলছি গুলিবর্ষণ হবে না। যদি গুলি করা হয় তবে কোন ছাত্রের গায়ে লাগার আগে তা আমার গায়ে লাগবে।" ড. জোহা তাঁর কথা রেখেছিলেন।'

সাঈদ, আপনিও কথা রেখেছেন, স্বপ্ন পূরণ করেছেন। আপনার প্রত্যাশা ও আকাঙ্খার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। এই বিবেকভূক সময়ে যখন দেখেছেন কেউ জোহা স্যার হতে চান না, তখন আপনিই হয়ে গেলেন একজন জোহা স্যার। আমরা দেখলাম, দেখল বাংলাদেশ ও পৃথিবী নামক এ গ্রহের তাবৎ মানুষ। কী অসীম সাহসিকতায় আপনি বুক টান টান করে দাঁড়ালেন পুলিশের বন্দুকের নলের মুখে? আপনার চোখে মুখে তখন অপূর্ব এক প্রত্যয় ও প্রতীতি।

যে পুলিশ আপনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে সে তখন আপনার প্রিয় ক্যাম্পাসে। আর আপনি তখন ক্যাম্পাসের বাইরে। এ যেন আপন গৃহে পরবাসী! যে ক্যাম্পাসে একজন পুলিশের প্রবেশ করতে হলে অনুমোদন লাগে প্রক্টর-ভিসির, সেই ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে আপনাকে গুলি করা হচ্ছে। আপনার মনে আছে সাঈদ, ব্রিটিশেরা একবার ভারত রক্ষা আইন করেছিল! কী বিচিত্র এই দেশ, কত অদ্ভুত এই সময়!

সাঈদ, আমাদের কেবল একটাই জিজ্ঞাসা, আপনাকে গুলি করার অনুমতি কোথায় পেল ওই পুলিশ? কে বা কারা দিল এই অনুমোদন। তার কোনো উত্তর নেই কারও কাছে। কোনোদিন পাওয়া যাবে বলেও প্রতীতি রাখা দুরুহ।

আপনি তখন নিরস্ত্র, সাঈদ। হাতে মামুলি একটা লাঠি, যা দিয়ে কুকুরকে ভয় দেখানোও দুরুহ। আপনি তখন স্থির। দৌড়ানো বা পালিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টা নেই আপনার ভেতরে। কাউকে আক্রমনের লক্ষণ নেই দেহ ভঙ্গিমায়। তবুও আপনাকে গুলি করা হলো। একটা নয়, একাধিক। ঠান্ডা মাথায়। আপনার বুক বরাবর তাক করে।

ইতিহাসের গতিপথের কী সাংঘাতিক মিল! জোহা স্যারের আত্মাহুতির মধ্যে দিয়ে সেদিনের গণঅভ্যূত্থান তার লক্ষ্যে পৌছায়। প্রত্যাহার হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রসভায় শেখ মুজিবকে দেওয়া হয় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি। সেই থেকে মুজিব ভাই হয়ে উঠলেন 'বঙ্গবন্ধু'। পতন হল আইয়ুবশাহীর।

যার ধারাবাহিকতায় এলো ৭০'র সাধারণ নির্বাচন এবং ৭১'র স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ। সাঈদ, আপনার মৃত্যুতে ঘুম ভাঙে আমাদের শিক্ষক সমাজের। আপনার মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পালন করেন প্রতিবাদ কর্মসূচি। সংখ্যায় অল্প। কিন্তু আপনি তো জানেন সাঈদ, ভালো কাজে, শুভ কোনো উদ্যোগে সবসময় অল্পসংখ্যক মানুষ থাকে। জোহা তো সবাই হন না। একজন হন।

১৯৬৯ সালে যারা ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উনাদের ক'জনকেই বা আমরা স্মরণে রেখেছি? আপনিই তো লিখেছিলেন সাঈদ, 'আপনার (মুহম্মদ শামসুজ্জোহ) সমসাময়িক সময়ে যাঁরা ছিলেন, সবাই তো মরে গেছেন, কিন্তু আপনি মরেও অমর। আপনার সমাধি আমাদের প্রেরণা। আপনার চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত। এই প্রজন্মে যাঁরা আছেন, আপনারাও প্রকৃতির নিয়মে একদিন একসময় মারা যাবেন। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছেন, মেরুদন্ড নিয়ে বাঁচুন। ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানান, রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের ঢাল হয়ে দাঁড়ান। প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না। আজন্ম বেঁচে থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে। অন্তত একজন শামসুজ্জোহা হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।'

সাঈদ, আপনার মৃত্যু আমাদের জন্য অসীম বেদনার। আমরা কেউই আটকাতে পারিনি চোখের জল। কেবলই একটা প্রশ্ন আমাদেরকে তাড়িত করেছে, জোহা স্যার না হয় শহীদ হয়েছিলেন পরাধীন দেশে। উনাকে গুলি করেছিল পাঞ্জাবি এক জওয়ান। আর আপনি মারা গেলেন স্বাধীন দেশে। যে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিল অসংখ্য শহীদ। আপনাকে গুলি করেছে কোনো পাঞ্জাবি জওয়ান নন, বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় কথা বলা একজন পুলিশ যার বেতন হয় আপনার-আমাদের দেওয়া করের টাকায়। যার পোশাকে লেগে রয়েছে আপনার বাবার শ্রমের ঘাম।

সাইদ, আপনি লিখেছিলেন, 'একজন শামসুজ্জোহা হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।' আপনার সাহসী এই উচ্চারণকে আমরা কুর্ণিশ জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, আপনার মৃত্যুও এই ঘুমকাতুরে জাতির জন্য অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের। আপনার সাহসী মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সরকারি চাকরির কোটা বিধিতে বৈষম্যের অবসান হয়েছে, ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন আপনি ও আপনারা।

১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি এক শিক্ষকসভায় মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা বলেছিলেন, 'আজ আমি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত। এরপর কোনো গুলি হলে তা ছাত্রকে না লেগে যেন আমার গায়ে লাগে।' এর পরদিনই বীরোচিত এক মৃত্যু হলো জোহা স্যারের। কী অবাক করা বিষয়! সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস দেওয়ার পরদিন একইভাবে সাঈদ আপনিও হয়ে গেলেন ২০২৪ সালের একজন জোহা স্যার।

আপনার বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, চেনা-অচেনা সকলেই কাঁদছেন আপনার জন্য। যে কান্না একদিন থেমে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু, আপনার বীরোচিত আত্মত্যাগ কখনও ভোলা যাবে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবহমান থাকবে সেই ইতিহাস। আপনি কেবল বাংলাদেশ নামক ছাপান্নো হাজার বর্গমাইলের গর্ব নয়, এ পৃথিবীরও গর্বের প্রতীক। কারণ এ পৃথিবী আপনার মতো একজন সাহসী সন্তানের জন্ম দিয়েছিল।

কেবল বাংলা ভাষায় নন, অন্যান্য ভাষাতেও স্মরিত হবেন আপনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা আপনাকে নিয়ে লিখবেন অমর কাব্যের অমর কবিতা। আপনি এ গ্রহের ইতিহাসে সংযোজন করেছেন অধিকার আদায়ের নতুন এক অধ্যায়, স্বাতন্ত্র্যধর্মী একমাত্রা; যা অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে করা দুরুহ।

সাঈদ, আপনার বীরগাঁথায়, আপনি বেঁচে থাকবেন কাল থেকে কালান্তরে; অমর কাব্যের অমর কবি হয়ে।

ডেইলি স্টার অনলাইনের সৌজন্যে। তারিখ জুলাই ২৮ ২০২৪, ০৫:৫৫ অপরাহ্ন।

জীবনে মরণে মরণোত্তর আবু সাঈদ

তুহিন ওয়াদুদ*

আবু সাঈদের মুত্যুতে শোকার্ত দেশবাসীর চোখের পানি এখনো শুকায়নি। বাবা-মা-ভাই-বোন-স্বজন এখনো আবু সাঈদের প্রসঙ্গ এল ডুকরে কেঁদে ওঠেন। এরই মধ্যে পুলিশ বাদী হয়ে যে মামলা করেছে তার প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে (এফআইআর) সত্যতে ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

এফআইআর দেখে প্রশ্ন জাগছে-মামলার পরিণতি কি ন্যায়বিচারের দিকে যাচ্ছে? অসংখ্য মানুষের চোখের সামনে আবু সাঈদ গুলিবিদ্ধ হয়েছে। অনেক টেলিভিশন লাইভ সম্প্রচার করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বক্তব্যে পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদনিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। অথচ আবু সাঈদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে-আন্দোলকারীদের ছোড়া গোলাগুলি ও ইটপাটকেলের নিক্ষেপের এক পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখন তার সহপাঠীরা তাকে ধরাধরি করে জরুরী চিকিৎসার জন্য বিকেল ১৫.০৫ ঘটিকার সময় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আবু সাঈদ কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমন্বয়ক ছিল। তিনি গত ১৬ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুলিশের ছোড়া ছবরা গুলিতে নিহত হয়েছেন।

আবু সাঈদ, তাকে ঘিরে তার এলাকার মানুষ স্বপ্ন দেখতেন। সেই সাঈদের মরদেহ নিয়ে যাওয়া অসহ্য কষ্টের। অন্য যে কোন দিন সাঈদ বাড়ীতে গেলে মা-বাবা গভীর আনন্দের সাথে অপেক্ষা করতেন। সেদিন অপেক্ষা করছিলেন মরদেহ দেখার জন্য।

আবু সাঈদের বাড়ীতে তার মরদেহ নিয়ে গিয়েছিলাম ১৬ জুলাই দিবাগত রাত ২টার দিকে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মরদেহ নেওয়ার জন্য ইংরেজী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান একটি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করেছিলেন। পুলিশের পক্ষে জানানো হয় পুলিশের ভাড়া করা অ্যাম্বুলেন্সে মরদেহ আবু সাঈদের বাড়ীতে নেওয়া হবে। আমরা আর ও জানলাম পুলিশি পাহারায় মরদেহ নেওয়া হবে। যাওয়ার সময় দেখলাম ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্মকর্তা এবং কয়েকটি পুলিশ ভ্যান। কেন এত কড়া প্রহরার প্রয়োজন হয়েছে জানি না। রংপুর থেকে বিশাল বহর গেছে পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়া বাজার পর্যন্ত। জাফরপাড়া থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে আবু সাঈদের বাড়ী।

টকবগে তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। তাকে ঘিরে এলাকার মানুষ স্বপ্ন দেখতেন। সেই সাঈদের মরদেহ নিয়ে যাওয়া অসহ্য কষ্টের। অন্য যে কোন দিন আবু সাঈদের বাড়ীতে গেলে মা-বাবা গভীর আনন্দের সাথে অপেক্ষা করতেন। সেদিন অপেক্ষা করেছিলেন মরহদে দেখার জন্য। গর্ভে ধারণ করা মা-বাবার মনে কত ঝড় যে বয়ে গেছে আমরা কি তার সামান্যটুকুও উপলব্ধি করতে পারব? মধ্যরাতের অন্ধকার ভেদ করে কান্নার করুণ সুর সেদিন উপস্থিত সকলকে স্পর্শ করেছে। মা-বোন-স্বজনের আর্তনাদে উপস্থিত অনেকের চোখ ভিজেছে। বাবার পাথরদৃষ্টিতে গড়িয়ে পড়েছে অশ্রু।

ছোটবেলা থেকে মেধার পরিচয় দিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন আবু সাঈদ। তার লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করার মতো সামর্থ্য পরিবারের ছিল না। নিজের লেখাপড়ার ব্যয় নিজেই মেটাতেন। লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ারও উপক্রম হয়েছিল কখনো কখনো। আবু সাঈদের বাড়ীতে থাকার আলাদা কোনো ঘর ছিলো না। দুভাই এক বিছানায় থাকতেন। বাবা সামান্য জমি থেকে একটা অংশ বিক্রি

---

* প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

করেছেন ঘর তোলার জন্য। দেয়ালটুকু কেবল তুলছেন। পরিবারের সদস্যরা বলেছিলেন সাঈদ বড় চাকুরি করবে-এটা তার স্বপ্ন ছিল। ৫৬ শতাংশ কোটা থাকলে সেই স্বপ্ন পূরণ করা যে কিছুটা কঠিন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তিনিও যুক্ত হন। যেদিন আবু সাঈদকে হত্যা করা হলো ঐদিন আমার সহকর্মী একাউন্টিং অ্যান্ড ইন্‌ফরশেন বিভাগের শিক্ষক উমর ফারুক, শাহীনুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নুরুল্লাহসহ আমারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ছিলাম। শিক্ষার্থীদের জন্য কি করা যায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। ক্যাম্পাসে ঢোকার মতো অবস্থা ছিল না। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলছিল। শিক্ষার্থীরা আহত হচ্ছিলেন, কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গায় আটকা পড়েছিলেন। আহতরা কিভাবে অ্যাম্বুলেন্স পেতে পারে, কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারে এসব কাজ করছিলাম। শিক্ষার্থীদের জন্য কখনো চিকিৎসক, কখনো পুলিশকে ফোন করছিলাম। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোঃ মনিরুজ্জামানকে ফোন করে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা এবং শিক্ষার্থীরা যাতে আহত না হয় সেই বিষয়ে অনুরোধ করেছিলাম। ঐদিন যতবার ফোন করেছিলাম পুলিশ কমিশনার ফোন ধরেছিলেন। আহত শিক্ষার্থীদের কিভাবে হাসপাতালে নেওয়া যাবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পুলিশ কমিশনারে সঙ্গে ফোনে কথা চলাকালে সংস্কতি-সংগঠক ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য এবং কলেজ শিক্ষক কাফি সরকারের মুঠোফোনে জানতে পারি আমাদের অনেক শিক্ষার্থী রাবার বুলেটে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তার মধ্যে একজন শিক্ষার্থীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমরা চারজন শিক্ষক মিলে হাসপাতালে যাই। যেতে পথে খবর পাই পুলিশের গুলিতে শিক্ষার্থী আবু সাঈদ বেঁচে নেই। তিনি ইংরেজি বিভাগের দ্বাদশ ব্যাচের শিক্ষার্থী। গত মাসের ৪ (চার) তারিখে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করেছে। নিজের ফলাফলটাও আর তার জানা হবে না।

হাসপাতালে পৌঁছে যে দৃশ্য চোখে পড়াল তা বর্ণনার বাইরে। শিক্ষার্থীরা আহাজারি আর ছোটাছুটি করছে। স্টেচারে নিথর শুয়ে আছে আবু সাঈদ। সহযোদ্ধার মহদেহ স্টেচারে নিয়ে শিক্ষার্থীরা রওনা দিয়েছিল ক্যাম্পাসের দিকে। পথ থেকে ফিরেয়ে এনছে পুলিশ। আমরা অপেক্ষা করেছিলাম তার বাড়ী থেকে কেউ এলে মরদেহ গ্রহণ করা হবে। সন্ধ্যায় বাড়ী থেকে আসে তার বড় ভাইসহ কয়েকজন আত্মীয়অ সাঈদের চাচাতো ভাই রুহুল আমিন পুলিশের সঙ্গে মরদেহ দেখতে গিয়েছিল। সে অনেকগুলো ছবিও তুলেছে। সেসব ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাথার পিছন থেকে অনেক রক্ত গড়িয়ে আছে স্টেচারে।

আবু সাঈদের বড় ভাই আবু হোসেন বলছিলেন, “আমার ভাই শহিদ হয়েছে। আমরা তার জন্য গর্ব করি”। অর্থ প্রদানের সময় কয়েকজন কথা বলেন। সেসময় উপস্থিত প্রায় সকলের চোখ ভিজে যায়।

আবু সাঈদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন হাসপাতালে সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিল।বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি বিজন মোহন চাকি, ইংরেজী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আসিফ আল মতিন, সহযোগী অধ্যাপক আলী রায়হান, সহকারী অধ্যাপক মৌটুসী রায়, জিলানী, একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের আশান উজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে পারি সাঈদ জানিয়েছিলেন আন্দোলনে সে মারা গেলে ক্যাম্পাসে যেন তার জানাজা নামাজ পড়া হয়। আসিফ আল মতিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে এ বিষয়ে যখন কথা বলেন তখন ক্যাম্পাস উত্তাল। উপাচার্য অবরুদ্ধ। তার বাসায় এবং কয়েকটি গাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়েছে। আবু সাঈদের মৃত্যুর খবরে ক্যাম্পাস রণাঙ্গাণে পরিণত হয়। উপাচার্যের বাসভবন ভাঙচুর হয়। এই পরিস্থিতিতে মরদেহ ক্যাম্পাসে নেওয়া সম্ভব নয় এমনটাই জেনেছেন আসিফ আল মতিন। সে কারণে আর ক্যাম্পাসে তার জানাজা পড়া সম্ভব হয়নি।

আবু সাঈদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। আবু সাঈদের হাত ধরে সেই লাঘবের স্বপ্ন দেখতেন তার বাব-মা। এই স্বপ্ন এখন অতীত। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার পরিবারের জন্য সাড়ে সাত লাখ টাকা সহায়তা দিয়েছে। সেদিন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আবু সাঈদের বড় ভাই আবু হোসেন বলছিলেন, "আমার ভাই শহিদ হয়েছে। আমরা তার জন্য গর্ব করি"। অর্থ প্রদানের সময় কয়েকজন কথা বলেন। সেসময়ে উপস্থিত সকলের চোখ ভিজে যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবু সাঈদের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। আরও অনেকেই কিছু কিছু করে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন। যদিও এই সহায়তায় সন্তান হারানোর শোক সামান্যতমও ভূলতে পারবে না তার বাবা-মা-স্বজন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কবি হেয়াত মামুদ ভবনের দ্বিতীয় তলায় বাংলা বিভাগ আর নিচ তলায় ইংরেজি বিভাগ। ফলে গত কয়েক বছরে অসংখ্যদিন সাঈদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সাঈদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ ছিল না। তার মৃত্যুে পর দেখেছি সে আমাকে ফেসবুক ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠিয়েছিল। আবু সাঈদের সঙ্গে জাগতিক আর কারো কোনো কথাই হবে না। তবে সাহসীর বেশে মৃত্যুকে বরণ করা আবু সাঈদ বীরের মর্যাদা পাবে। মানুষ বহুকাল তাকে মনে রাখবে। আমরা চাই মামলা তদন্ত নিরপেক্ষ হোক। এই তদন্ত ছাড়াও বিচার বিভাগীয় তদন্ত আছে। অন্তত সেখানে প্রকৃত চিত্র উঠে আসুক। কেবল আবু সাঈদ নয় দেশের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

আবু সাঈদ মারা যাওয়ার আগের দিন ফেসবুকে লিখেছে 'অন্তত একজন শামসুজ্জোহা হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের। তার মৃত্যু জগত জুড়ে সম্মানের আর গর্বের হয়ে উঠেছে।

ডেইলি স্টার, অনলাইন সংখ্যার সৌজন্য। জুলাই ২৯.২০২৪, ০৫.১৩ অপরাহ্ণ।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও নতুন বাংলাদেশ

ড. মোঃ মনিরুজ্জামান*

ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরবময় ঘটনা বলে বিবেচিত। স্বাধীনতা-পূর্ব ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছাত্রদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা এরশাদ সরকারের পতনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং নিরাপদ সড়ক আন্দোলনেও ছাত্রদের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনটি ছিল মূলত স্কুল-কলেজে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তৎকালীন সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক ভুলত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে ১ জুলাই আন্দোলনে নামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। শুরুতে এ আন্দোলন অহিংস ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বেপরোয়া হলে ১৫ জুলাই আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। অতঃপর শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। সহিংসতার মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। যার শেষ পরিণতি হয় ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের মাধ্যমে। ৫ আগস্ট পতন ঘটে দীর্ঘ ১৬ বছরের কর্তৃত্ববাদী সরকার শেখ হাসিনার। সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা এবং ৪৪ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হতো। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ছাত্রদের ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সে সময় এ আন্দোলন আর কোটা সংস্কারের মধ্যে নিহিত ছিল না। এভাবে স্বৈরাচার সরকারের দীর্ঘদিনের চলমান দুর্নীতি, টেণ্ডারবাজি, বিদেশে অর্থ পাচার, মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ এবং সর্বোপরি মানুষের নিত্য পণ্যের লাগামহীন ঊর্দ্ধগতি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এসব বিষয়ে বৈষম্য লাঘব করাই ছিল ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত সরকার কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে দলটি ক্ষমতায় আসে। আওয়ামী লীগ ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে। এরপর সরকার পর্যায়ক্রমে ২০১৪ সালে দশম, ২০১৮ সালে একাদশ ও ২০২৪ সালে দ্বাদশ বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জোরপূর্বক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এ শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যেক নেতাকর্মীর বেফাঁস মন্তব্য, আমিত্ব, অহমিকা, দাম্ভিকতা, স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়করণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। 'আয়নাঘর' নামক গোপন বন্দিশালায় মানুষকে আটক করে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো। 'মায়ের ডাক' নামক সংগঠনের ব্যানারে হারিয়ে যাওয়া ও গুম হওয়া স্বজনদের আর্তনাতে বাতাস ভারি হয়ে উঠতো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূল যে দাবি ছিল, তা সমাধান করা ছিল অত্যন্ত সহজ একটা ব্যাপার। কিন্তু সরকারের একগুঁয়েমীর এবং দলের দায়িত্বশীল নেতাদের অতিরঞ্জিত কথার কারণে শেষ রক্ষা হলো না। ১৬ জুলাই বিশ্বের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এদিন আমাদের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে প্রকাশ্যে পুলিশ গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ পাশবিক ঘটনা দেশ-বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যার ফলে সরকারের ক্ষমতায় থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ হাসিনাই একমাত্র সরকার প্রধান যিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। সেই সঙ্গে তিনি আওয়ামী

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

লীগের মতো একটি ঐহিত্যবাহী দলকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে অগণিত নেতাকর্মীর মনোবল ভেঙ্গে চুরমার করে দেন।

জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা বিতর্কিত সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন শান্তিতে নোবেলবিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ২১ উপদেষ্টা। একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এ সরকার গতানুগতিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নয়। দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিংহভাগ মানুষের সমর্থনে এ সরকার গঠিত। তাই দল-মত নির্বিশেষে সবার উচিত এ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করা, কারণ বর্তমান সরকার ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। শত শত ছাত্র জনতার প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশেকে তাই আমরা দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে অভিহিত করছি। রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণই হচ্ছে ছাত্রদের মূল লক্ষ। ইতোমধ্যে কতিপয় রাজনৈতিক দল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন দিতে চাপ দিচ্ছে। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশকিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা জাতির সামনে তুলে ধরার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। একটি বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা রাখা উচিত, তা হলো গত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে রাষ্ট্রের এহেন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল না। এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শাসনামলও তেমন সুখকর ছিল না বললেই চলে। ভবিষ্যতে যে দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হবে, তাকে অতীতের সকল গ্লানি মুছে দিয়ে ছাত্র-জনতার কাঙ্ক্ষি নতুন বাংলাদেশ উপহার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারে যেসব প্রস্তাব দিয়েছে, বর্তমান সরকার তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ সরকারের জন্য তা যেনো কার্যকরী হয়, সে বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। আগামীতে যে দলই সরকার গঠন করবে, সেই দলের মধ্যে গণতন্ত্রচর্চা অব্যাহত রেখে দলের খোলনলচে পাল্টাতে হবে। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে, তাহলে সহস্রাধিক প্রাণের বিনিময়ে ছাত্র-জনতার কষ্টার্জিত ফল বিফলে যাবে। শুধু তাই নয়, নতুন বাংলাদেশ গঠনে ব্যর্থ হলে ছাত্র-জনতা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ নতুন সরকারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে এবং সেইসঙ্গে আত্মদানকারী শহীদদের রক্তের সাথে বেঈমানের কারণে জাতি তাদের কখনো ক্ষমা করবে না। নতুন সরকারের কর্মকাণ্ডে যদি আগের সরকারের মতো নানা অপকর্মের ধারা দৃশ্যমান হয়, তাহলে একথা দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যায়, ২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের প্রারম্ভিক সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী সরকারের যে পরিণাম হয়েছে, নয়া সরকারের ক্ষেত্রে তার চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই আগামীতে যাদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদেরকে এখন থেকেই সতর্ক পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে করে দেশে আর কখনো স্বৈরাচারী সরকারের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

[লেখাটি ইতোমধ্যে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকার উপসম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয়েছে।]

চৌপায়া দমনে দ্বিপদের চিত্তে নবজাগরণ

মোঃ হাবিবুর রহমান*

কেন এত বৈষম্য মা? আমার অল্প বয়সে হাজারো প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খায়। আমার মাকে সব জিজ্ঞাসা করি। পৃথিবীতে মানুষের জন্য কেন এত আয়োজন? মা বললো, শুনো মাহমুদ, এক সাথে এতো প্রশ্ন করতে হয় না। প্রথমত, মানুষ নিজেদের স্বার্থে বৈষম্য করছে এবং সীমিত সম্পদের অব্যবস্থাপনার কারণে এগুলো হচ্ছে। পৃথিবীতে উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে এবং সম্পদের অসম বণ্টন একটি বড় কারণ। আরেকটু বড় হয়, তাহলে ধনী দরিদ্রের মধ্যে তফাৎ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়ত, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, জমি, পানি ও পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ মানুষের উপকারে তৈরী এবং তা প্রতিনিয়ত মানব সমাজের উপকারে নিয়োজিত রয়েছে। মানব সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবের মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কখনো একে অপরের পরিপূরক, আবার কখনো একে অপরের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানব সমাজ এবং পশুকূল একে অপরের কাছ থেকে শেখে। আবার একে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। এ নিয়ে তুমি অনেক কবিতা, উপন্যস এবং গল্প পাবে, তা পড়। আমি এক অজপাড়া গাঁ এ জন্ম নিয়েছি। নানান বিষয়ে আমি চিন্তা করি। বৈপিরীত্য এবং অসামঞ্জস্য বিষয়গুলোর উত্তর খুঁজার চেষ্টা করি। আমার গ্রাম অনেক সুন্দর এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। পাখির কিচিরমিচির শব্দ, বৈচিত্র্যময় ফুলের সুবাস, কৃষাণ-কৃষাণীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে অর্জিত সোনালি ফসল, সতেজ সব্জির চাষ এবং গ্রাম্য হাট আমাকে বিমোহিত করে। আমি এখানে আমার খেলার সাথী ও অন্য অঞ্চলের মানুষকে পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানাই। কারণ আমি জানি এ সৌন্দর্য উপভোগ করে শেষ করা যাবে না।

আমি প্রাণীকূল ও মানব সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্যময় বন্ধন নিয়ে বিস্মিত। যেমন George Orwell লিখিত 'Animal Farm' আমি সংগ্রহ করে পড়েছি। এটা অন্যরকম একটি সাহিত্যকর্ম। Animal Farm মূলত একটি কাল্পনিক রাজনৈতিক রম্য রচনা যা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এখানে উপন্যাসে প্রাণীকূল নিজেদের জন্য যে একটি রাজ্য কায়েমের স্বপ্ন দেখে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্রিটিশ সাংবাদিক ও লেখক তাঁর ঐ লেখায় দুই পা বিশিষ্ট জীব সত্তা তথা মানুষকে নিপীড়ক এবং শত্রু হিসেবে রূপায়িত করেছেন। আমি ভাবি আসলে কি মানুষ তাই করছে? নাকি পশুকূল মানুষকে নিয়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণার বিস্তার করছে? আমি মাঝেমধ্যে বৈশ্বিক ঘটনাবলি থেকে উপলব্দি লাভ করি যে, মানুষ কিছুক্ষেত্রে পশুর চেয়ে নগণ্য ও অধম। কারণ বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ মানুষের ওপর মরণাস্ত্র ও বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক বোমার ব্যবহার করছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ঘেঁটে দেখা যায়, খুব কম সময়ই বসুধায় শান্তি বিরাজমান ছিল। আবার শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় থাকলেও তা রক্তাক্ত অধ্যায়ের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি এবং বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। আমার কাছে বিপ্লব রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

> "বিপ্লব ঘূর্ণায়মান যুগের ক্রান্তিলগ্নে
> তারুণ্য জেগে ওঠে বারবার দুর্বার গতিতে
> বোধে পশুত্বের নগ্ন উল্লাস
> নাকি মনুষ্যত্বের প্রাধান্যে মানবিকতা জয়?
> বেহাদ বিপ্লবে পুনর্জাগরণ কবে আসবে?
> পাশবিকতায় ভুলুণ্ঠিত মানবতা
> নবজাগরণে চিত্তের কোণে পশুর উপাখ্যান

---

* কবি, লেখক ও গবেষক

চৌপায়া দমনে দ্বিপদের চিত্তে নবজাগরণ
মনুষ্যত্ব জাগরণে তারুণের আহ্বান।"

সভ্যতা ও সমাজ বিনির্মাণে চিন্তার বিকল্প নেই। মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে। এ সমাজে কীভাবে এ পর্যায়ে পৌঁছেছে তা নিয়ে আমি সারাক্ষণ চিন্তা করে সময় ব্যয় করি। যাকে পাই, তাকে হাজারো প্রশ্নে জর্জরিত করি। বয়োজ্যেষ্ঠ, অগ্রজ ও অনুজ কেউ আমার প্রশ্ন থেকে রেহাই পায় না। কেউ কেউ আমার প্রশ্নের সদোত্তর দিতে না পারলেও আমার কিছু প্রশ্ন এবং কথা শ্রবণকারীর মনে দাগ কাটে। তাই পারতো পক্ষে আমার সামনে আবাল থেকে বণিতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। এতে আমি মনে কষ্ট পাই না। কারণ আমি জানি আমাকে এভাবেই বই অধ্যয়ন এবং জ্ঞানের মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। এছাড়াও আমি জানি জিজ্ঞাসা এবং গবেষণা ছাড়া এগুলোর সঠিক উত্তর নেই। অন্যদিকে আমি বিশ্বাস করি, কেউ না কেউ, আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। এলাকা ও বিশ্বের খবর রাখা আমার নেশা। আমি যখন পাঠাগারে যাই, তখন পত্র-পত্রিকা ও বই অধ্যয়ন করে যা পায় তা পড়ার পাশাপাশি যতটুকু পারে চিরকুট লিখে রাখি। পরবর্তীতে এগুলো দিয়ে মানুষকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।

বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে?

কেন হচ্ছে?

এগুলোর নির্মোহ বিশ্লেষণ করা যেন আমার নেশা। বিশ্বের নানা দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, কূটনীতি সম্পর্কে আমি জানতে চাই। আধুনিক সময়ে আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও অন্যান্য কাজের পাশাপাশি তা ইতিবাচক কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন, দেশ ও বহিঃর্বিশ্বের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য জানার জন্য সারাক্ষণ ইন্টারনেট সার্চ করি। পরবর্তীতে তা নিয়ে বিতর্ক ও পারস্পারিক আলোচনায় লিপ্ত থাকি। যদিও এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ ও হিংসুটে কতিপয় মানুষ এ নিয়ে খোশগল্প ও গোপনে বলাবলি করে। কিন্তু এ সকল বিষয় নিয়ে আমি একটুও চিন্তিত নই। আমি জানি এ সকল অপবাদ এবং বিতর্ক আমার কিছুই করতে পারবে না। কারণ আমার মাস্টার জাব্বার স্যার বলেছেন, আমাকে সত্যটা জানতে হবে এবং অপরকে তা পৌঁছানোই আমার অন্যতম দায়িত্ব। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে কোন অন্যায় ও অবিচার দেখলে আমি রুখে দাড়াই। কখনো সরাসরি বিরোধিতা করি। কখনো মুখে অন্যায্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। আবার এ দুটো ক্ষেত্রে না পারলে, মন থেকে ঐ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। আমি আমার মক্তবের শিক্ষক থেকে জেনেছি যে, ধর্মীয় দৃষ্টিতে এ সকল পন্থা অবলম্বন করলে, পরকালে তাকে পূণরায় জবাবদিহিতা করতে হবে না। আমি জানি, অন্যায়ের প্রতিবাদ, মজলুম ব্যক্তি ও শিশুর পাশে দাঁড়ানো একজন সুনাগরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

আফসোস! কোথায়ও যেন নিয়মের বালাই নেই। যে যার মত করে চলছে। নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন যেন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি রাস্তায় বের হলেই দেখে পথচারী ও চালক নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলছে না। কিন্তু আমি ইন্টারনেট, বই অধ্যয়ন এবং ভ্রমন পিপাসু ব্যক্তিদের মাধ্যমে জানতে পারি যে বহির্বিশ্বে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে ট্রাফিক আইন মেনে চলছে। আমি আরো জানতে পারছি যে, এক সময় তারাও অসভ্য এবং উচ্ছৃঙ্খল জাতি ছিল। সভ্যতার উন্নতি, আইনের শাসন এবং নাগরিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা বর্তমান বিশ্বে সুখী ও সমৃদ্ধি জাতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই আমি চাই বাংলাদেশেও যেন এ ধরনের নিয়ম কানুন বিদ্যমান থাকে। মানুষ সড়ক আইন মেনে চলে। আমি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে সড়কে বিশৃঙ্খলা এবং বেহাল দশার বিবরণ পাই। সড়কে নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের বয়সী শিশু-কিশোররা এক সময় সড়ক আন্দোলনে ডাক দেয়। আস্তে আস্তে আমিও জড়িয়ে পড়ে সড়ক আন্দোলনে। যে আন্দোলন

অল্প সময়ে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের নামকরা পত্র-পত্রিকার শিরোনামে স্থান করে নেয়। আমি একদিন আমার চাচাতো ভাই শিপন আহমেদ কে বলি, দেখো তো, এ নৈরাজ্য ও অনিয়ম কি মেনে নেওয়া যায়?

সে বললো, কী সেটা আবার? আমি বললাম দেখো, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পিতা-মাতা আমাদের নানা নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়। অথচ, সেই একই বয়সের মানুষ নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই সড়কে রীতিমত আইন আমান্য করে যাচ্ছে। অন্যদিকে চালক, পথচারী এবং ট্রাফিক পুলিশ সবাই আমাদের সমাজের অংশ। সবার ট্রাফিক আইন মেনে চলার পাশাপাশি অনিয়ম করে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। চলো, তাদেরকে এ বিষয়ে আমরা সচেতন করে তুলি।

এক পর্যায়ে সড়ক আন্দোলন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। সড়ক আন্দোলনে গতি পায় এবং কিছু দিনের জন্য সড়ক নিরাপদ থাকে। সরকার সড়কে অচলাবস্থা দূরীকরণে শেষ পর্যন্ত নানা দাবি মেনে নেয়। যদিও এখনও বিভিন্ন উৎসবে কিংবা মাঝেমধ্যে খবরের শিরোনাম দেখি- 'সড়ক যেন মৃত্যুরফাঁদ।' এভাবেই নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং আন্দোলন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা শেষে আমার স্কুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তীতে আমার কলেজ জীবনের পড়া-শোনা শেষ করি, অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। এখানে এসে দেখি এক লঙ্কা কাণ্ড। জোর যার মল্লুক তার। এ রকম একটা অবস্থা। তাই আমি চিন্তা করি কিছু একটা পরিবর্তন হলে ভালো হতো। কারণ আমি ভাবি একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এভাবে চলতে পারে না। সরকার বেআইনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ও পথভ্রষ্ট বাহিনী তৈরি করছে। এক সময় যে শিক্ষার্থী গ্রামে ও মহল্লায় খুবই ভদ্র ছিল, সেই অনুরূপ ব্যক্তি ক্যাম্পাস ও হলের সংস্কৃতি পেয়ে নিজেকে আমূল বদলে ফেলেছে। যেমন দিনেস ভূঞার কথা বলা যাক। সে আমার এলাকার জুনিয়র ছোট ভাই। তার বংশ এলাকায় খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং নাম যশ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভালো একটি বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর, সে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলে। হলের কয়েকজন সিনিয়র ভাইদের কথায় সে জুনিয়র শিক্ষার্থীদের গায়ে পর্যন্ত হাত ওঠায়। মাঝেমধ্যে সে হলের ক্যান্টিন থেকে মাগনা খায়। অথচ গ্রামের বাড়িতে তাঁর বাবা-মা মানুষের অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তাঁদের কোন বস্তু স্পর্শ করে না। ক্যান্টিনের ম্যানেজার ও মামারা কত কি যে মনে মনে বলে, আল্লাল মিয়াই ভালো জানেন। তারা বিষয়টি ভালোভাবে নেয়না। পেশীশক্তি ও রাজনৈতিক অবস্থার কারণে তারা কিছু বলতে পারে না। তবে তাদের মুখের অবস্থা দেখলে বোঝা যায়। মাঝেমাঝে আমার সাথে শেয়ার করে, মামা এভাবে চললেম ব্যবসায় লালবাতি জ্বলবে। কখনো তারা স্বগতোক্তি করে বসে।

"আবে . . . হুনো
মাগনা খাওন চাও?
লাইনে আহো।
মেরা ভাই ভাত খাগা
সোখে থাকতে ভুতে কিলায়।"

যদিও আমি ও আমার কিছু সহপাঠী এ দিক থেকে ব্যতিক্রম। আমি শত কষ্টে দিন অতিবাহিত করলেও কোন ক্যান্টি থেকে মাগনা খাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখি। আমি টিউশনি এবং পরিবার থেকে প্রাপ্য অর্থ মাসে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করি। কখনো কখনো টাকার অপ্রতুলতার কারণে সকালের নাস্তা না খেয়ে ক্লাসে যাই। আবার মাঝেমধ্যে দিনে কখনো এক বেলা খাবারও জুটে না। তারপরেও ক্যাম্পাসে কিংবা হলে মাগনা খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়, হল, নিজস্ব বিভাগে এবং ক্যাম্পাসে যেখানেই অন্যায় ও অনিয়মের খুঁজে পায়, সেখানেই আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াই। বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আমার যেন নিরন্তর পথ চলা। আমি কাউকে ভয় পাই না। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে আমি ভয় পাই। আমি মনে করি, এ মহান স্রষ্টাকে সবারই ভয় করা উচিত। বিশ্বের নামকরা মনীষী এবং দেশ প্রেমিক ব্যক্তিদের জীবন থেকে আমি শিক্ষা লাভ করি। মাঝেমধ্যে এ বিষয়গুলো অন্যদের সাথে আলোচনা করি। মৃত্যুর ভয় আমার চোখে নেই। মেধার মূল্যায়ন আমি চায়। কিন্তু আমি জানতে পারি যে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি থাকায় অনেক মেধাবী তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন। সেই আন্দোলনে আমি নিজেকে ও সক্রিয় করে তুলি। আমি অনুধাবন করি যে মেধার সঠিক মূল্যায়ন না হলে একটি দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যায় না। দেশপ্রেমিক নাগরিক, নিষ্ঠাবান এবং যোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হয়। আমি কবিতা খুব ভালোবাসি। আমাদের সহপাঠীর মধ্যে একটা অংশ কবিতা আবৃত্তি করার পাশাপাশি তা আঁকড়ে ধরা চেষ্টা করতো।

আমি বৈশ্বিক বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রাম নিয়ে সবসময় রোমাঞ্চিত ও উচ্ছ্বসিত। আমি দেখি যে, বিশ্বের সব আন্দোলন সংগ্রামে তরুণদের অংশগ্রহণ রীতিমত বিস্মিত। আমরা যে কিছু ছিনিয়ে আনতে পারি, সেটা নিশ্চিত। অসহায়ের মুখে অন্নদান, জাতীয় স্বার্থ পুরুদ্ধার, এবং নিজের অধিকার রক্ষায় আমরা সবসময়ই সেচ্চার থাকি। কারণ দেশের ক্রান্তিলগ্নে আমরা কাজ করি। যেমন একবার আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সহায়তার প্রদানের কর্মসূচি হাতে নেই। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে আমরা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ি।

> "তারুণ্যের পদচারণায় প্রকম্পিত আজ রাজপথ
> রুখে দাও
> রুখে দাড়াও
> এ স্লোগানে উত্তাল রাজপথ
> মেরুদন্ড সোজা রাখতে তরুণ প্রজন্ম দিচ্ছে ডাক
> তাদের গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত
> তারুণ্যের জয়গানে মুখরিত বসুধা
> দেশের জন্য জীবন দিতে তারুণ্যের উদাত্ত আহ্বান
> সব বাঁধা পেরিয়ে রাজপথ আজ জনসমুদ্রে পরিণত।
> সাম্য
> মানবিক মর্যাদা
> সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রত্যয়
> বিদ্রোহী স্লোগানে উত্তাল রাজপথ।"

একটি দেশ, অঞ্চল ও ভূ-খন্ড অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর গড়ে ওঠে। এ বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার পিছনে অনেক দেশী-বিদেশী শাসকের অবদান নিয়ে আমি রীতিমত গবেষণা করি। আমার পর্যবেক্ষণে উঠে আসে যে, বর্গি মারাঠা দস্যু, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং শত্রু বাহিনীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কতিপয় বিপ্লবী ও শাসক এ বাংলার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অটুট রেখেছে। তাঁদের কাছে এ ভূ-খণ্ডই সব। তাঁদের রাজকীয় অবয়ব ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াছ শাহ তেমনি একজন বীর ও শাসক। তিনি অবিভক্ত বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে আখ্যায়িত। মধ্যযুগীয় বাংলার সুলতানের মধ্যে তিনি অন্যতম সুলতান, যার শাসনামলে বাংলা এক সুদৃঢ় অবস্থান লাভ করে। যুগে যুগে বৃহত্তর বাংলার স্বার্থ রক্ষায় অনেক শাসক ও বিপ্লবী আত্মত্যাগ

করে ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে আছেন। সুলতানি আমলে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসার হওয়ার বাংলা তাঁদের কাছে ঋণী। আমার কাছে বাংলা 'দোজখ ই পুর নিয়ামত (A Hell Full of Good Things) নয়, বরং তা কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের অঞ্চল। তেমনি এখানে দেশপ্রেমিক এবং সৎ লোকেরও অভাব নেই।

"বাংলার রাজপথ রক্তিম আভায় ভরপুর
বাংলার ইতিহাস যেন মহাকাব্যের সনেট
যার পরতে পরতে আছে বিভীষিকাময় পর্ব
কখনো ষড়যন্ত্রে মসনদ তছনদ
অসাধারণ দেশপ্রেম তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা
আবার কখনো প্রাণ বিসর্জনে অক্ষয় স্বাধীনতা
সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বীরের আবির্ভাব।
জ্বলাময়ী ভাষণে তূর্য নিনাদ।"

বাংলা নামক ভূ-খণ্ডটি নানা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক নগরী। যুগে যুগে নানা পরাশক্তি, বিভিন্ন সভ্যতা, প্রাচীন সাম্রাজ্য এবং বীরেরা, এখানে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা চালিয়েছে। যদিও অনেক রক্ত ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত তারা এখানে প্রাধান্য বিস্তারে ব্যর্থ হয়। আমি ভাবি কালেকালে বাংলার বীরপুরুষরা এ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং থাকবে। একজন চলে গেলেও অন্য কোন মহাপুরুষ তার স্থান দখল করে নিবে। মানুষ ও অসহায়দের মুখে হাসি ফোটাবে। আমার কাছে বাংলা যে এশিয়ার আফ্রিকা, যেখানে ইউরোপে কৃত্রিম সৌন্দর্য উপেক্ষিত।

"সাগর -বেষ্টিত এ অঞ্চলের খ্যাতি সীমাহীন
বঙ্গোসাগর এ অঞ্চলের জন্য আর্শীবাদ।
ত্রিভুজাকৃতি এ ব-দ্বীপে প্রাকৃতিক সম্পদ ভরপুর।
ব্লু-ইকোনমি কিংবা বাংলার কাস্টোডিয়ান হিসেবে স্বীকৃত
বঙ্গোসাগরে বাণিজ্যের বিস্তার যেন হরমুজ প্রণালি খ্যাত।
কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্ত অপরুপ
নিঝুম দ্বীপে পর্যটকদের নিশ্চুপ ভাব
সেন্টমার্টিন দ্বীপে দেশ-বিদেশী ভ্রমণ পিপাসু।
পাহাড়ী কন্যার দেশে কাঞ্চনজঙ্ঘা।"

একদিন মা আমার কাছে দেশ প্রেমের গল্প শোনালেন। তিনি বললেন, শুনো মাহমুদ! একজন সন্তানের পক্ষে যেমন মায়ের অবদান ও ত্যাগের প্রতিদান ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। তেমনি একজন নাগরিকের পক্ষে একটি দেশের অবদান ও সেবার মূল্য কখনো পরিশোধ করা সম্ভব নয়। মাতৃভূমি হলো মায়ের মতন। যা রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব এবং পুর্ণ্যের কাজ। পশুপাখি যেমন তাদের অভয়ারণ্য দখলে রাখার জন্য প্রকৃতি ও মানবসমাজের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে। ঠিক তেমনি মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় দেশকে ভালবাসে ও রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। সতুরাং তোমাকে সেই মাতৃভূমি রক্ষায় কাতর থাকতে হবে। তারপর এ বিষয়ে আমি আরো বইপত্র খুঁজে অধ্যয়নের চেষ্টা করি। পূর্বপুরুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পর্যালোচনা করে আমি কখনো কাঁদি, আবার কখনো নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমি আলোচিত -সমালোচিত সব ধরনের বই পড়ি। ঢাকার নীলক্ষেত এবং বিভাগীয় শহর থেকে সাম্প্রতিক প্রকাশিত ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ সে সংগ্রহ করে।

এইতো বেশ কিছু দিল হলো, আমি আহমদ ছফার লিখিত উপন্যাস অলাতচক্র (১৯৮৪) এবং লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য-এর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ (২০২১) অধ্যয়ন শেষ করেছি।

"এ মাতৃভূমি সবার ভুলে যেওনা কভু
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা
মোদের গৌরব জড়িয়ে আছে এ মাটির গায়
বহুদামে কেনা এ ফুল যা বিনিময়হীন
অমূল্য রতন এ ভূ-খন্ডের প্রতি ইঞ্চি মাটি
এ দেশ আমার
এ মাতৃভূমি তোমার
মেহনতীমানুষসহ আপামর জনসাধারণের
এ যেন ভুলতে বসছি মোরা ক্ষণিকের লোভ-লালসায়
পার্থিবের মোহে প্রবেশ করছি অন্ধকার জগতে
কিছু লোক মাথা উঁচু করে দেশপ্রেমে দিচ্ছে আত্মবিসর্জন।"

সভ্য সমাজে মানুষের কতিপয় নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্র ও সমাজ সুন্দরভাবে পরিচালনায় অনেক মনীষী, বিপ্লবী এবং মহা মানবের জন্ম এ ধরণীকে আলোকিত করেছে। যা স্ব-স্ব অঞ্চলের মানুষের সামাজিক মর্যাদা এবং সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে অধিকাংশ মানুষ বিবেকহীন, দুর্নীতিপরায়ণ, লোভী এবং মির জাফরের মত চরিত্র ধারণ এবং বিশ্বাসঘাতকাতার কারণে ইতিহাসের বিপরীত মেরুতে হেঁটেছে যা একটি দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। আমি ও আমার বন্ধু তাশফীক খান হলের বিতর্ক পরিষদের মিলনায়তনে সমবেত হয়ে সমসাময়িক বিষয়াবলী নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। সরকার ও ছায়া সংসদের আদলে গঠিত ৬ সদস্যের সমন্বয়ে একে অপররের নিকট যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করে। চলে বেশ কিছুক্ষণ পাল্টাপাল্টি বাক্যুদ্ধ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ ক্ষেত্রে মডারেটর ও বিচারক বিতর্কের ফলাফল ঘোষণা করতে গিয়ে বেশ হিমশিম খায়। যা আমাদের রাতের আড্ডার খোরাক জোগায়।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম নানান বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। কেউ পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে, আবার কেউ নতুনত্ব ও পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করে। আমি মনে করি অতীত ইতিহাস এবং প্রাচীন বাংলা থেকে তরুণ প্রজন্ম শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। যদিও বয়োজ্যেষ্ঠ আমাদের নিয়ে তেমন একটা আশাবাদী নয়, এ বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। বৃদ্ধরা এবং মাঝবয়সী কিছু মানুষ মনে করে যে আজকের তরুণ প্রজন্ম শুধু প্রযুক্তি যেমন ফেসবুক, টিকটক নামক নানান যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্ত এবং সামাজিক বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকে। কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়ে যে আমরা নতুন বাংলাদেশ বির্নিমাণে স্বপ্ন দেখছি, সেটা তাদের কৌতূহল জন্ম দেয়। আমরা তরুণ প্রজন্ম যে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত, সেটা সত্যিই বিস্ময়কর! আমরা যেন হয়ে উঠছি বাংলার নবাব সিরাজ উদ্ দৌলা। আমার সাথে বাংলার নানান বয়সী শিশু কিশোর, তরুণ সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। ভিনদেশী শত্রুপক্ষের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলা, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির নিশ্চয়তা এবং সীমান্তে নিজ দেশের জনগণকে রক্ষাই যেন এ নতুন বাংলাদেশের অন্যতম লক্ষ হয়ে উঠেছে। নিজ মাটি, বাতাস ও প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য আমরা সবাই বদ্ধপরিকর।

সমাজ ও রাষ্ট্র বির্নিমাণে প্রবন্ধ, সাহিত্য পত্রিকা এবং নানান সাময়িকী-ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ, নির্যাতন এবং মানসিক দাসত্ব বিদ্যমান থাকায় আজকের সংবাদপত্রে আমি গঠনমূলক এবং অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট কম পাই। তাই আমি নানান ভাবনায়

নিমজ্জিত। আমি গ্রন্থাগারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই না পেয়ে পুস্তকালয়ে আমাদের সহপাঠী যথাক্রমে রাব্বী চৌধুরী, রাবেকা পদ্দার, হুমামা খাতুন, কণিকা সরকার এবং ইশরাক মন্ডলকে নিয়ে বই পছন্দ করতে যাই। আমাদের সহপাঠীরা অতটা বই পোকা নয়। সেজন্য তারা আমার পছন্দ ও মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে বই ক্রয় করে। আমি আমাদের বন্ধুদের বলি যে, বাজারে মান সম্মত বই খুবই কম। আবার যে সকল বিদ্যমান তা বিভিন্ন প্রশংসা ও চাটুকার কর্ম দিয়ে ভরপুর। অন্যদিকে কিছু মানসম্মত বই আছে, তা বেশ কয়েক দশক যাবৎ নিষিদ্ধ। তাই আমি ঐ নিষিদ্ধ বইগুলো এবং যে সকল লেখকের বই পুস্তকালয়ে অপ্রদর্শিত থাকে তা তাদের দেখানো জন্য বিক্রেতাকে চুপিসারে বলি। বিক্রেতাও তাই পছন্দমতো সেগুলো জনসম্মুখে না দেখিয়ে কানেকানে বলে এই নেন মামা! গোপনে খাম বন্দি করে প্যাকেটে দিয়ে দেয়। তাই আমার সহপাঠীরা আমার সাথে গিয়ে নানা রোমাঞ্চকর ও ভয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে। কারণ এ সকল বই আবার সরকার ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেখলে আমাাদের নানা হয়রানী ও মামলা দিতে পারে।

"সংবাদপত্র বাতাবি লেবু নিয়ে যেন ব্যস্ত
গণমাধ্যম কি তার দায়িত্ব গিয়েছে ভুলে?
বিবেকহীন রিপোর্ট নিয়ে করছে তামাশা
দেখেও না দেখার ভান করছে অবলিলায়।
কিছু সাংবাদিক ভয়কে করছে জয়
মামলা-হামলা সত্ত্বেও সত্য প্রকাশে নির্ভীক রয়
ফিনিক্স পাখির মত অটুট রয়।"

ঈগল যেমন সব অঞ্চলে নিজের রাজত্ব করতে চায়, তেমনি কিছু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং শাসক ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু আমিসহ আমার কিছু সহপাঠী সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে পরিকল্পনা করি। অন্যদিকে এক সময় যে যুবক দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার শপথ ও জীবন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে তাদের অবস্থা দেখে আমরা চিন্তিত। কারণ কিছু যুবক ও বয়োজ্যেষ্ঠ আজ দিকভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। অর্থ ও নানান বৈশ্বিক লোভে পড়ে দেশ ও মানুষের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমরা কয়েকজন মিলে এ দুঃসহ পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ ও উত্তরণের জন্য অত্যন্ত গোপনীয় একটি কৌশল নির্ধারণ করার পাশাপাশি আন্দোলন ধারাবাহিক রূপরেখো তৈরি করে। শুরুতেই আমরা মূলত মেধাভিত্তিক চাকরি প্রদানের নিশ্চয়তা নিয়ে আন্দোলন শুরু করি। যদিও এ ধরনের আন্দোলন আমরা কয়েক বছর আগেও করেছিল। কিন্তু সরকার আমাদের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আবার আইনি জটিলতা তৈরি করেছে। সেই সময় টিয়ারশেলে আমার বন্ধু তামিমের অবস্থা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থা ধারণ করে।

আমি ও আমার সহপাঠীরা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজের জীবন বাজি রাখতে বদ্ধপরিকর হই। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শের শিক্ষার্থীরা থাকলেও দুর্নীতিপরায়ণ শাষক ও অযোগ্য লোকের বিরুদ্ধাচরণ এবং মেধার মূল্যায়নে সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকার করার প্রতিজ্ঞা নেই। এছাড়াও আমরা এ বিষয়ে একমত হই যে, আন্দোলনে কেউ আহত বা নিহত হলে একের পর এক ক্রমান্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে। তবুও আন্দোলন থেকে এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পিছপা হবে না। শুরু হয় আমাদের বর্ষা বিপ্লবের বিজয়গাথা। যা দিয়ে কয়েকটি মহাকাব্য লেখা যাবে। আমি প্রায় সময়ই "বাংলার মহাকাব্যে অপ্রতিরোধ্য বীরেরা" কবিতাটি অঙ্কনের চেষ্টা করতাম। সে শ্লোকটি আমি আমার বন্ধু ও প্রিয় মানুষদের নিকট বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপন করা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাই।

"বিবেকহীন রবে আর কতদিন !
হে রক্ত মাংসে গড়া জ্যান্ত মানুষ
তোমার নির্লিপ্ততায় কাঁদছে নারী-শিশু পাড়া-মহল্লায়
কান্ডারীর জন্য অপেক্ষায় দিন গুণছে অবলিলায়
এ বাংলা আখ্যায়িত অপরাজেয় এক বীরের জাতি
মরণপণ লড়াই যার নিয়তি।
বিজয় কিংবা বিপর্যয় মোকাবেলা যার নিত্যসঙ্গী।
শহীদ তিতুমীর
হাজী শরীয়ত উল্লাহ প্রেরণার উৎস।
ভবানীপাঠক
নূরউদ্দীন বাকের জং ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আইকন
দেবী চৌধুরাণী ছিলেন গরীবের রাণী
জয়দুর্গা দেবী যেন ব্রিটিশদের জন্য ত্রাস স্বরূপ।

"কখনো শিশু
কখনো কিশোর-কিশোরী
কখনো যুবক-যুবতি
কখনো তরুণ-তরুণি
কখনো নানান বয়সী নাগরিকের অকুতোভয় লড়াই চলমান
এ বাংলা রক্ষায় অকুতোভয়
তুমি কি না হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছো অসহায়দের উপর !
নিরস্র মানুষের উপর তোমার থাবা
অকূল পাথারে নিমজ্জিত বিশ্বভূবন
এ কেমন কাপুরুষোচিত আক্রমণ!
সাহসী কোন বীর মানবে না এ নির্দয় আচরণ
সালাহউদ্দীন আইয়্যুবীও শত্রুকে ঘায়েল করতে আশ্রয় নেননি কোন প্রহসন
শত্রুর অস্ত্র এগিয়ে দিয়ে সমতা বিধান যুদ্ধের ময়দান
বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী আজও তাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাভরে
শত্রু বাহিনীর সাথে দৃশ্যমান কাপুরুষোচিত আচরণ
লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বেড়াও শত্রুদেশে
জনসাধারণকে বিপদে ফেলে দাও যুদ্ধের ময়দানে
অস্ত্র থাকার পরেও তোমার অবস্থা পরাজয়কারী-কাপুরুষের মতন।"

"অন্তরীক্ষে উড়ছে বাজপাখি
ডানাহীন ঈগল কিংবা যুদ্ধবিমান।
বাতাসে রক্তিমার গন্ধে আজ প্রকম্পিত বসুমতি
ঊষার কোণে ঘূর্ণায়মান হারিক্যান ক্যাটরিনা
প্রলয় ধ্বনি কিংবা অগ্নিবীণার লেলিহান।
বাংলার আকাশে উড়ছে অচেনা বাজপাখি
শকুন কিছুটা ভ্রান্তিপ্রদ
রাতের আধারে নির্বিচারে চালায় নির্যাতন
কায়েম করছে ত্রাসের রাজত্ব।

শিক্ষাঙ্গনে চলছে অপরাজনীতি
মেধাবীরা অসহায় অযোগ্যদের আদেশ বাস্তবায়নে
চাকরিতে মেধার প্রাধান্য কমছে ক্রমশ
গবেষণায় নেই কোন নতুনত্ব
উদ্ভাবনে এখনো পিছিয়ে বাংলা
উদ্যোক্তারা উড়াল দেয় ভিনদেশে
জনগণের টাকায় কেনা বারুদ মারছে অকাতরে
যার হিসাব কষতে হবে এক সময়
ইহকাল কিংবা পরকালে।"

মানুষের করের টাকায় একটি দেশ তার বিভিন্ন উন্নতি সাধন করতে পারে। তবে উন্নয়ন নিশ্চিত করা, যেন এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমি মনে করি আধুনিক বিশ্বের কিছু রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের করের টাকা এবং দেশের সম্পদ নিজ জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। যা রীতিমত খামখেয়ালিপনা ও বেইমানির নামান্তর। পত্র-পত্রিকায় আমি মাঝেমধ্যে যা দেখতে পাই যে, বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, এবং কতিপয় ব্যক্তি কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে সম্পদ পাচার করছে। অথচ সে এ সম্পদ ও অর্থ দিয়ে নিজ দেশে বিনিয়োগ করে জনগণের উপকার করতে পারতো। উন্নয়নশীল দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বসবাসরত মানুষগুলোর ভাগ্য ও জীবনমানের কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থনৈতিক বৈষম্য আমাদের দেশের অবস্থা তেমন ভালো নেই। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র নানা ষড়যন্ত্র করছে।

"আজ যে অস্ত্র দিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় হতো ব্যবহার
তার নিষাণা আজ কোন এক সহোদর
দৃশ্যমান স্বজাতির লোকজনের হাহাকার।
কি নির্মমতা !
প্রহসন লুকিয়ে এ সকল ভূয়া লোকদের
ভুলে যাচ্ছে তারা এক আদমেরই সন্তান
কর ফাঁকি যেন সাধারণ ঘটনা
স্বদেশী টাকা ভিনদেশে পাচার
বিনিয়োগবিহীন বাংলায় মুদ্রাস্ফীতির সয়লাব।"

রাষ্ট্রের সেবক এবং কর্মচারী যেখানে জনগণের পক্ষে কাজ করবে সেখানে তার উল্টো কাজ করছে। তারা জনগণের টাকায় জীবন নির্বাহ করলেও জনগণের সাথে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আমি এ সকল বিষয় নিয়ে রীতিমত ক্ষুদ্ধ। আবার এ সকল সেবক ও কর্মচারীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই ব্যতিক্রম এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে বিবেচিত। এ সকল দেশপ্রেমিক ও নীতিবান লোক সমাজে, রাষ্ট্রে ও নানা দপ্তরে তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক বানিয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো হয়েছে। সামাজিকভাবে তাঁদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে। মিথ্যা ও দুর্নীতির মামলা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নানা প্রকার মিথ্যা মামলা-হামলা নিমজ্জিত করা হয়েছে। কখনো কখনো নিরপরাধ ব্যক্তি জেলে অন্তরীণ থেকেছে। এ জাতীয় বিষয়াবলী আমাকে অনেক পীড়া দেয়। এছাড়াও প্রকৃত অপরাধী ও ঋণখেলাপী ব্যক্তি সমাজে বুক উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অন্যদিকে জুলাই বিপ্লবে অনেক বিষয় আমাদের শিখিয়েছে। একে অপরের সাথে দূরত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করেছে।

"নিজের সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীকে করছে অপমান

অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ।
সন্তানের অধিকারের কথা বলায় মায়ের সাথে করছে দুর্ব্যবহার
শত ধিক্কার উচ্চারিত কথিত সুশীলসমাজের রাঘব বোয়াল
তথাকথিত কিছু প্রগতিশীলদের নিলির্প্তিতায় যেন পশুও অবাক।
এ ক্লান্তিলগ্নে তাদের নিশ্চুপ অবস্থা মানার নয়।"

রাষ্ট্র নিজের প্রয়োজনের আইন প্রণয়ন করে। একটি রাষ্ট্র তার জনগণের মতামত নিয়ে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, আইন এবং বিধি বিধান চালু করে। যেখানে একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সামাজিক প্রথা এবং সার্বজনীন বিষয়াবলী মাথা না রেখেই আইন প্রণয়ন করা হয়, সেখানেই অচলবস্থা দেখা দেয়। এছাড়াও রাষ্ট্র যদি স্বৈরাচারী হয়ে উঠে তখন জনগণ বাধ্য হয়ে সে শাসন ব্যবস্থা বিরুদ্ধে বলয় গড়ে তুলতে। আমি আমার সহপাঠী ও জনগণ নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের স্বপ্ন দেখি। আমি উপলব্দি করি, রাষ্ট্রীয় কাঠামো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আদলে এবং বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে যেন স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করছে। মাঝেমধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে উঠেছে ভয়ানক অসুর এবং দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাবের দিকে রাষ্ট্রকে ধাবিত করছে। এ সকল বিষয়ে সংস্কার না হলে, জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। যুগে যুগে মানুষ রক্ত এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ইতিবাচক পরিবর্তন মানুষের নসীবে ঝুটেনি। তাই এইবার আমরা এ সকল কাঠামোগত দুর্বলতা, গঠনতান্ত্রিক অনিয়ম ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করতে চাই। এ পথ মসৃণ নয়। যেতে হবে বহু পথ। অনেক ত্যাগ ও তিতীক্ষা করতে হবে নিশ্চয়। আমিসহ অন্যান্য বিপ্লবীদের চোখে এ স্বপ্ন, যেন আমরা এ বাংলাকে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভূ-খণ্ড হিসেবে গঠন করা যায়। এ জন্য আমরা আমূল পরিবর্তন চাই। আমি চাই আমরা যেমন সাধারণ জনগণ, তেমনি আমাদের পরিচয় সৈনিকও। তাই রাষ্ট্রের উচিত আমাদের সামরিক, সীমান্ত রক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া। এ জুলাই আন্দোলনে আমাদের সহপাঠীদের সাথে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন মেনে নেওয়া যায় না।

"নিরাপত্তা রক্ষায় আইন নিয়ম মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।
সর্তকবাণী প্রচার না করাও অন্যায়
বেআইনিভাবে কেউবা পশুর মত করছে আচরণ।
কখনো করছে সরাসরি গুলি
কিংবা টিয়ারশেল নিক্ষেপ
আবার কখনো নির্দয়ভাবে উঠিয়ে দিচ্ছে গাড়ি
সাঁজোয়া যান দেহের উপর অবলিলায়
পিষ্ঠ হয়ে কাতরাচ্ছে কত মায়ের জানের টুকরা
শত অত্যাচারে নির্ভীক মহাবীর।
দেশের পতাকা রক্ষায় বদ্ধ পরিকর
সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠায় করছে আন্দোলন।
কেউবা বরণ করছে পঙ্গুত্ব
কেউবা আবার জেলে অন্তরীণ
বিনা কারণে ঝরে গেল অজস্র প্রাণ।
অঙ্কুরেই বিনষ্ট তাজাপ্রাণ
ফুলের কলি অকালে নির্ঝর।
ক্ষত বিক্ষত দেহের নানান স্থান
এ হত্যার দায়ভার কার?

বিবেকের আদালতে তুমি কি নিষ্পাপ?
জবাবদিহি করতে হবে অচিরেই জনতার আদালতে
জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ
একই কাতারে শামিল।
নানা অন্যায়ের হিসাব নিবে এই জনতা
অবিচারে অধিষ্ঠ হয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত আপামর জনতার।
ন্যায় সাম্যভিত্তিক সমাজপ্রতিষ্ঠায় তারা বদ্ধপরিকর।
এইবার আর পার পাবে না কোন মির জাফরের উত্তরসূরীরা
চেতনার করতে অপব্যবহার রুখবে এই জনতা।
জনগণকে বিভ্রান্ত করার পায়তারা যাও ভুলে
দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়ার পায়তারা বন্ধ
বিদেশী প্রভুর আজ্ঞাবাহী নেকড়েদের দিকে অগ্রসরমান বিপ্লবী
জনতা আজ ফুঁসে উঠেছে আদায় করবে সব হিসাব-নিকাশ।"

দেশ প্রেমিক ব্যক্তি ও রাষ্ট্রনায়ক সবসময়ই জনপ্রিয় এবং তরুণ প্রজন্মের নিকট আদরীয়। আমি বিশ্বের নামকরা মনীষী ব্যক্তি ও বিপ্লবীদের জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে চলছি। আমি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ক্লাস ও অধ্যয়নের ফাঁকে শিক্ষার্থীদের বাংলার মহাবীরের গল্প শোনাই। বলি, দেশকে রক্ষায় যেন তারা সবসময় সোচ্চার থাকে। এ সকল বিষয়ে নানা গবেষণা প্রবন্ধ তরুণ প্রজন্মকে আমি পড়তে উৎসাহ জোগাই।

"মেজর এম এ জলিল-এর স্লোগান প্রতিধ্বনিত
অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা
সীমান্তে অরক্ষিত জনপদ যেন মৃত্যুরফাঁদ
বাহিনীর কিছু লোক ঝাঁপিয়ে পড়ছে জনগণের উপর
জনগণের করের টাকায় করছে নানা অপকর্ম
বিশ্বাসঘাতকতায় মির জাফরের ছায়া সর্বত্র
ভিন দেশী প্রভুর চামচামীই একমাত্র কাজ
তাদের আজ্ঞাবাহীতে ব্যস্ত সর্বদা।
জনগণের সাথে করছে শত্রুপক্ষের মত আচরণ
রাষ্ট্র-জনগণ নিয়ে নেই কোন ন্যূনতম জ্ঞান।
জনগণের সাথে সদ্ব্যবহার নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
নেলসন ম্যান্ডেলার আজ খুব প্রয়োজন।
সত্যিকারের কবি
লেখক
বিপ্লবী মানুষ খুবই অপ্রতুল।
সঠিক নেতৃত্ব যেন বিপরীত স্রোতে ভাসছে
পাঞ্জেরীর অভাবে ধুঁকছে এ নগর
বাংলার তরুণ সমাজের অসীম সাহসীকতায়
পরিপূরণ সে মহিমান্বিত স্থান।"

মানুষ রক্ত মাংসে গড়া হলেও সে পশু এবং জন্তুর মত আচরণ করে। মাঝে মধ্যে তার বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। কখনও কখনও সে মেশিন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মত আচরণ করে। আমি মনে করি

চৌপায়া দমনে দ্বিপদের মননে নবজাগরণ জরুরী। কারণ ৪ পা বিশিষ্ট জন্তু জানোয়ারদের চরিত্র এবং ২ পা বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ৪ এবং ২ একে অপরকে অনুকরণ করছে। এই অনুকরণে কেউ কেউ বাস্তবতা ছাড়িয়ে উদ্ভট আচরণ করছে। যেমন সিংহ ক্ষুধার্ত থাকলেও মাঝেমধ্যে হরিণ শাবককে মুক্তি দেয় এবং অন্য হিংস্র প্রাণি থেকে দুর্বল প্রাণীকে রক্ষা করে। অন্যদিকে মানুষ সামান্য অর্থ ও অল্প সম্পদের জন্য নরপিশাচ হয়ে যায়। এমনকি বোবা এবং অবুঝ শিশুর জীবনও রক্ষা পায় না। এ ধরণের কার্যক্রম রীতিমত ভয়ঙ্কর এবং মানব সমাজের অবক্ষয়ের অন্যতম মূল কারণ। কখনো কখনো মানুষ হিংস্র প্রাণী যেমন হায়নার চেয়েও পাষাণ হয়ে ওঠে। আবার পশুর শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে মানবিক গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠছে। এ উভয় সংকট দূরীকরণে আজ আমরা একদল তরুণ প্রতিজ্ঞাদ্ধ ও একতাবদ্ধ।

"তবে কেন তুমি আজ মানুষরূপী রোবটে পরিণত?
বিবেক থেকেও তুমি আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিচ্ছো প্রমাণ
ধিক্কার জানায় সবাই তোমার এ নির্লিপ্ততায়
দ্বিমুখী আচরণের ভৎসর্না জানায়।
মানুষ হয়েও কেন পশুর মত করো আচরণ?
ন্যূনতম মানবিক বোধ কি নেই তোমার?"

একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেকগুলো অনুষঙ্গ জড়িত। রাষ্ট্র জনগণের মেলবন্ধনে বেশ কিছু উপাদান সম্পর্কিত যা ছাড়া রাষ্ট্র এক মূহুর্ত্ব চলতে পারে না। জনগণ যদি সচেতন ও দেশপ্রেমিক না হয়, তাহলে সে রাষ্ট্র ও সমাজ অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভিনদেশী সংস্কৃতি ও শাসন আরোপিত হয়। তাই আমিসহ অন্যান্য আন্দোলনকারীদের চাওয়া রাষ্ট্রের সবগুলো অনুষঙ্গের সাথে জনগণের নিবিড় সম্পর্ক থাকা উচিত। একটি রাষ্ট্রকে আমি মানব দেহের সাথে তুলনা করি। আমি ভাবি যে, রাষ্ট্র নামক দেহটি অনেকটা জীর্ণশীর্ণ হয়ে আছে। যদিও রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বরত ব্যক্তি বেশ মোটা ও সুখী। সে ঠিকই নিয়মিত তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রকে কারো সাথে বিমাতা সুলভ আচরণ করা উচিত নয়। কারণ ন্যায়বিচার, আইনের চোখে সমান এবং নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে গিয়ে কারো পক্ষাবলম্বন করলে সে রাষ্ট্রের ভীত নড়ে যায়। মানুষ রাষ্ট্রের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললে তা কারো জন্য মঙ্গলজনক নয়। সেজন্য আমি প্রত্যাশা করি এমন একটি রাষ্ট্র তৈরি করতে হবে, যেখানে সবাই সমান সুযোগ পাবে।

"রাষ্ট্র - নাগরিকের মাঝে রয়েছে এক অপরূপ মিলবন্ধন।
জনগণ যদি নাইবা থাকে?
রাষ্ট্র কিভাবে দাঁড়াবে স্বমহিমায় ?
জনগণ সরকার একে অপরের পরিপূরক।
এ যেন দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ
চারটি উপাদানবিহীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যেমন হুমকি স্বরূপ
তেমনি একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে অশান্তি সর্বত্র
জনগণ
সরকার
ভূ-খন্ড
সার্বভৌমত্বের মাঝে বাড়ছে ফারাক সব সময়।"

পশু এবং জানোয়ার সব সময় হিংস্রতা প্রদর্শন করলেও কদাচিৎ তাদের মধ্যে মায়া জন্মে। তারা অনেক সময় দুর্বলদের উপর চড়াও হয় না। সবল হয়েও সে দুর্বলকে পথ চলতে সাহায্য করে।

কখনো কখনো বক তার রিযিক না খেয়ে তা পানিতে যেতে সহায়তা করছে। যেমন শুকনো মাটিতে মাছ পড়ে থাকার কারণে বক সেখান থেকে পানিতে ছেড়ে দিচ্ছে। যাতে সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। নিশ্চিত শিকার পাওয়া সত্ত্বেও সে পানিতে যেতে মাছকে সাহায্য করছে। অথচ মানুষ অসহায় এবং নিরস্ত্র ব্যক্তির উপর হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমি ভাবি যে, ভাল রাষ্ট্রনায়ক না পেলে এ বাংলার সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে না।

"জড় পদার্থ মানবের মাঝে পার্থক্য বেশ।
পশু কিংবা মানুষের বৈসাদৃশ্য পার্থক্য করা মুশকিল।
কিছু মানুষ করছে পশুর মত আচরণ
তবে কি সে হারিয়েছে তার মানবিক সব গুণাগুণ ?
নাকি অবিবেচক আচরণ সবসময় প্রদর্শন ?
ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে দানব
দৈত্যের মতন অবয়ব ক্ষাণিকটা ভয়ঙ্কর।
অসহায়দের করুণ রোধন
তাদের কাছে মিথ্যে আস্ফালন।
বৃথা রোনাজারি হাহাকার
ভুলে যায় এ সকল রাক্ষসের প্রাণ আবদ্ধ
বোতলের এক মণি কোঠায়
অচিন সমুদ্রের তলদেশে আবদ্ধ
তা ছিনিয়ে আনবে তরুণ সম্প্রদায়
আচমকাই বিনষ্ট হবে সেই দৈত্যের প্রাণ ভ্রমর।
সুপ্তকণা থেকে বিচ্ছুরিত হবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাভা।
নিমিষেই শেষ হবে যত দাম্ভিকতা
অহংকারের পাহাড় দুমড়ে মুছড়ে পড়তে বাধ্য
পালাতে বাধ্য হবে স্বেচ্ছাচারী
নাগ-নাগিনী নিমিষেই শেষ হবে এ প্রান্তরে।
বিমানবন্দর, জল-স্থলে হয়ে উঠবে পালানোর বাহন
সিরিয়া কিংবা আফগানিস্তানের মতন
পালাবে ভিনদেশে গ্লানিময় জীবনরক্ষায় ।"

আমাকে একদিন আমার শিক্ষক মারজুক হোসেন ডেকে এনে বিভিন্ন উপদেশ দেয় এবং ইতিহাসের অপ্রিয় সত্যবিষয় আমার নিকট তুলে ধরে। তিনি আমাকে বলেন, তুমি এ জাতীয় বিষয়াবলী গ্রন্থাগারে বিদ্যমান ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এর গ্রন্থগুলোতে পাবে। সেখানে তুমি দেখবে যে, এক সময় আরব ও ইউরোপে অসভ্য জাতির বসবাস ছিল। ইউরোপ যেমন মহাযুদ্ধের খেলা ঘর তেমনি আরব বিশ্ব ছিল আইয়্যামে জাহেলিয়াতের লীলাভূমি যা আরব বিশ্বকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। পবরর্তীতে আরবে জন্ম নেয় মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা:)। তিনি এ ধরণীতে এসে অন্ধকার থেকে আলোতে মানুষকে নিয়ে আসেন। মানুষকে ন্যায় ও সঠিক পথের দাওয়াত দেন। জীবন্ত নারীদের পুঁতে ফেলা বারণসহ নারীর অধিকার, গোত্র ও বংশের দাম্ভিকতা পরিহার, মানুষের অধিকার ও সম্পদের সুষম বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান ও আসমানি বিধান তুলে ধরেন। যদিও শেষনবী মুহাম্মদ এর উপদেশ ও স্বর্গীয় বিধান আরবরা এবং বহির্বিশ্ব আস্তে আস্তে ভুলতে বসছে। পৃথিবীতে চলছে এক মহা ত্রাসের রাজত্ব যেখানে মানুষের অধিকার আজ ভূলণ্ঠিত। বর্তমানে মানুষের মানসিক উন্নতির বিকাশ এবং মানবাধিকার প্রসার

ঘটলেও মানুষ দিন দিন তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে। পশুর চরিত্র ধারণ করে মানবরূপী সত্তা অন্য মানুষের সাথে অন্যায় ও অবিচার করে বেড়াচ্ছে। এ চৌপায়া দমনে দ্বিপদের চিত্তে যে নবজাগরণ প্রয়োজন তা আমাকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে তাঁর শিক্ষক উপদেশ দেয়। তখন আমি জানাই এ তো কঠিন বিষয় ও বর্তমান বাস্তবতায় আকাশ কুসুম কল্পনা। তারপর তাঁর শিক্ষক বলে তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাও। তুমি আগে নিজে পরিবর্তন হও এবং অপরকে বলো। এটাই তোমার কাজ। সক্রেটিস যেমন তার শিস্য প্লেটোকে শিক্ষা ও উপদেশ দিচ্ছে, তেমনি আমার শিক্ষক আমাকে করণীয় দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

"জাতি হিসেবে আমরা কত নির্লজ্জ বেহায়া।
সহজেই করতে চাই না কোন কাজ
কিংবা যৌক্তিক চাওয়ার পূরণ।
শক্তের ভক্ত নরমের যমের মত করছি অভিনয়
দ্বিমুখী আচরণে মত্ত সারাক্ষণ।
স্বজাতীর ক্ষতিতে বদ্ধপরিকর
অপকারে সব সময় মেতে উঠি অনায়াসে।
নিজের খেয়ে পরের গুণ গাইতে ব্যস্ত সর্বদা
সবাই যখন এগিয়ে শিক্ষা-গবেষণায়
মোরা ব্যস্ত খামখেয়ালিপনায়
বিজ্ঞানে মোদের অবদান নিতান্তই কম
কিছু সত্তা অন্তর্ঘাতে লিপ্ত
হিংসায় মত্ত সারাক্ষণ।
আটকে আছে আইয়্যামে জাহিলিয়াতের যুগে কোন মোহনায়।
আধুনিক যুগেও কতিপয় লোক অসভ্য
স্বেচ্ছাচারীর মতন প্রদর্শিত কিছু আচরণ
চৌপায়া দমনে দ্বিপদের চিত্তে নবজাগরণ একান্ত প্রয়োজন।"

আধুনিক বিশ্বে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং প্রতিপত্তি নিয়ে আমি চিন্তিত। আমি অনুধাবন করলাম যে, তরুণ প্রজন্ম প্রাশ্চাত্য চিন্তা-ধারা এবং মননে বড় হচ্ছে। এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমার দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হলো যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্বার্থ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস উপেক্ষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হলেও মানসিক দাসত্ব থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি। স্বদেশের খেয়ে এবং মাতৃভূমিতে বড় হয়েও শত্রুপক্ষ দেশের জন্য কাজ করায় আমি তাদের ধিক্কার জানাই। একজন ব্যক্তি জানতেই পারে না যে, সে নিজের অজান্তে ভিনদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি মনে করি, যদি দেশই না থাকে তাহলে এ নরাধমদের অবস্থা সিকিমের লেন্দুপ দর্জি (Lhendup Dorji) এবং বাংলার মির জাফরদের মত রাজনীতিবিদদের পরিণতি ভোগ করতে হবে। তারা নিজ দেশ ও শত্রু পক্ষ কারো কাছেই সম্মান পায়নি। মানব সমাজের ইতিহাসে এবং যুগে যুগে তারা ঘৃণিত এবং পশুতুল্য। জুলাই অভ্যুত্থানে সবার অবস্থান দিন দিন পরিস্ফুটিত হতে লাগলো। রাষ্ট্রযন্ত্রের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগলো।

"পাঠদানকারী
হিতোপদেশদানকারী
মানবতার ফেরিওয়ালাদের চুপ থাকায় ধিক্কার সর্বত্র
শিক্ষক

সাংবাদিক
কর্মকর্তা
কর্মচারী
প্রতিষ্ঠান প্রধান
পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ অবহেলায় প্রাণ ঝরছে অকারণ।
বিবেক বিবর্জিত এ সমাজে অমানুষ বাড়ছে চক্রবৃদ্ধি হারে
শিক্ষা অর্থ বাড়লেও মনুষ্যত্ব কমছে সমান্তরালে।
জাতির বিবেক
লেখক
কবি
শিল্পী আজ গুহায় লুকায় যেন ইঁদুরের জীবন যাপনে ব্যস্ত
কিংবা গর্তে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচায়।
আবার যারা কিনা এ বিষয়ে কিছুটা সোচ্চার
তারা মামলা-হামলায় জর্জরিত
মৃত্যুভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে দশদিক।
বিশাল বসুমতিতে ধিক্কার সর্বত্র
নানাস্থানে তাঁরা অপমানিত-অপর্যস্ত
মনুষ্যত্ববিহীন নেতা
জনপ্রতিনিধির নির্লিপ্ততা
সুশীলের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল।”

মানুষ, বিশ্বাসঘাতক ও স্বৈরাচারে চরিত্র নির্ণয়ে মারাত্মক ভুল করে। পশুরুপী মানুষ এবং অত্যাচারী শাসক তার নিজের প্রয়োজনে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পক্ষকে ধ্বংস করে দেয়। তাই সে জানে না যে, কখন তার যমদূত এসে হাজির হবে। আমি ভাবি যে, এ সকল নীতিবিবর্জিত মানুষ দিয়ে সমাজ ও জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। একজন বিশ্বাসঘাতককে কেউ কখনো মূল্যায়ন করে না।

“আজ না হয় কাল
তুমিও হবে জালিম কিংবা স্বৈরাচারের নির্যাতনের সম্মুখীন।
সময় থাকতে তুমিও জাগ্রত করো তোমার বিবেকের দুয়ার
সময় ফুরালে পাবে না পরিত্রাণ
সমসুরে গাও মনুষ্যত্বের জয়গান
নতুবা আখ্যায়িত হবে বিবেকহীন এক প্রাণ
খাঁচাসহ এক অসম্পূর্ণ জীব
দেখিয়ে দাও তুমি পশুর চেয়ে ভিন্ন
এক আশরাফুল মাখলুকাত
রুখে দাও যত সব অত্যাচার
কিংবা অন্যায় নির্দেশ।
ন্যায় আদেশ পালন করো ওহে রাষ্ট্রের সেবক।
ন্যায়-নীতিতে অটল থাকো হে মানব
গোলামীর পিঞ্জির কেন?
দাসত্বের যে জীবন করেছে বাছাই।
উদ্ভট আচরণ দেখে পশু অবলিলায় হাসে

দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে কয়জন এগিয়ে চলছে ?
বহির্বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রয়
নিজ দেশে শান্তি রক্ষায় দ্বিমুখী আচরণে বিশ্ব অবাক তাঁকিয়ে রয়
এ নীতি বিবর্জিত অবস্থান প্রহসনের নামান্তর
দোদুল্যমান কে মেনে নেয়?
তোমার নামে ধিক্কার সর্বত্র।"

মানুষের বিবেক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আদালত। আমি ভাবি যে, এই বিবেক নষ্ট হয়ে গেলে, মানুষ যে কোন সমাজ ও দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে। সে জন্য তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক শিক্ষা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও দেশীয় ভাষা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসা উচিত। অন্যদিকে আইন-আদালত ও গ্রাম্য সালিশে মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে কাঁদায়। কারণ মূল অপরাধী অনেক সময় অর্থ ও পেশী শক্তির বদৌলতে নিজের পক্ষে মামলার রায় নেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। এজন্য বিচার ব্যবস্থায় সৎ, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, যোগ্য, ন্যায় ও নীতিবান লোককে নিয়োগ এবং দায়িত্ব দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাকশক্তি হারিয়ে ফেলো না থাকতে তোমার কণ্ঠস্বর
পাঞ্জেরী হয়ে বেঁচে থাকো এ জগৎ মাঝার
বাগ্মিতায় জ্বালাময়ী ভাষণে দূর করো যতসব কুসংস্কার।
লেখনী দ্বারা শাণিত করো এ বসুন্ধরার বিটপীর পল্লব
কিংবা দেওয়ালের আল্পনায় আঁকো বীরের কালজয়ী অবয়ব।
বিবেকহীন মনুষ্যেত্ত্বের প্রতি তারুণের এ উদাত্ত আহ্বান।

তরুণ প্রজন্ম সবসময় অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করতে পছন্দ করে। তাদের কাছে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন হুমকি, গোলাবারুদ এবং হুঙ্কার কোন কাজে আসে না। আমি ও আমার বন্ধুরা সরকার বিরোধী আন্দোলনে নানা স্লোগান ও কবিতা আবৃত্তি করে। আমাদের দেখা দেখি সকল কলেজ, মাদ্রাসা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং সাধারণ নারী-পুরুষ যোগ দেয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান, কবিতা এবং অন্যান্য ব্যক্তির উক্তি জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের ভাষা ও স্লোগানে শক্তি যোগায়। তবে কাজী নজরুল যেন হয়ে ওঠে জুলাই বিপ্লবের অন্যতম কারিগর। ঠিক যেমনি ফরাসি বিপ্লবে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন রুশো, মন্টেস্কু এবং ভলতেয়ার। *"কারার ঐ লৌহ-কপাট/ ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট-কাজী নজরুল ইসলাম* । আবার কেউবা এ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গেয়েছে, *"এই শিকর পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল/এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবে রে বিকল"-কাজী নজরুল ইসলাম*।

রাজপথ দখলে চলে যায় কবি ও লেখকদের অমীয় সব উক্তিতে। ভূ-কম্পনে নড়বড়ে বাংলার বিশাল অট্টালিকা। মানুষ ঘরে আর বসে থাকতে পারে না। তাদের কাছে নির্যাতন, হুমকি ও গোলাবারুদ যেন খেলনা মনে হয়। আমাদের এ জোয়ার নিয়ে আশাবাদীদের চিত্তে প্রীতি ও দ্রোহ জেগে উঠে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান যেন ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকা বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, কিউবা বিপ্লব এবং ইরানের বিপ্লবকেও হার মানায়। অন্যদিকে আমার বন্ধু তিমুরের কাছে এ বিপ্লব যেন ট্রুজান যুদ্ধের মত লাগে যা এথেন্স ও ট্রয় নগরীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

"তারুণ্যের এ গণজোয়ার কখনো পরাজিত হবার নয়
প্রেম-দ্রোহ ছেড়ে বসন্তের দিকে এগিয়ে চলছে অবিরত
আরেক ফাল্গুন আনতে তারা বদ্ধপরিকর।
বধূঁয়ার ছোঁয়া ছেড়ে তাঁরা নির্বিক

অমরত্বের নেশায় এ তারুণ্য হাঁকছে বিপ্লবের গান
বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ এ স্লোগান
নানা প্রত্যয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলছে মহাপ্লাবনের মতন।
হারানোর কিছু নেই এ প্রহরীর
জাতিকে দেওয়ার অনেক কিছু তাদের সামনে বিদ্যমান।
সমাজ পরিবর্তনে নতুন প্রত্যয় নির্মাণ
বৈষম্য রোধে তারা আজ বদ্ধপরিকর।
এ মিছিলে অংশগ্রহণে বয়স কমবে বহুগুণ
নিজেকে মনে হবে চির যৌবনা
স্পষ্টভাষী তরুণের উদাত্ত আহ্বান
ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে বের হলেই পালাবে কাপুরুষ
বিপ্লবী অধিষ্ঠিত হবে সিংহের আসনে
পৃথিবীর সাঁজোয়া যান যেন শুধু মরীচিকা
বুলেট তোমার কাছে নিতান্তই নগণ্য
এ অপরাজেয় স্রোত রুখবে কে?।”

আমাকে একদিন আমার বন্ধু বিতার্কিক বন্ধু তাশফীক খান চিন্তিত দেখে জিজ্ঞেস করলো। বাহে! কি হলো তোর, হামাক বলো!
আমি তখন বললাম যে, বিশ্বব্যাপী ও আঞ্চলিক পর্যাযে যে আন্দোলন সংগ্রাম হচ্ছে তা নিয়ে আমি ক্ষাণিকটা চিন্তিত।
তাশফীক খান: ক্যানে হামাক বলো।
তখন আমি বললাম, প্রতিটি সংগ্রাম এবং বিপ্লব চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর পরবর্তীতে কিছু প্রজন্ম এবং ব্যক্তি আন্দোলনের সুফল ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে। এছাড়াও আন্দোলনের মাঝখানে অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল করেছে। তাই বর্তমান আন্দোলন সংগ্রাম নিয়েও আমি চিন্তিত। কারণ আমি মনে করে প্রকৃত দেশ প্রেমিক ও বিপ্লবীরা কখনো সুবিধা আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে না। তারা নিঃস্বার্থভাবে যে কোন সংগ্রাম ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। মানুষের মুখে হাসি ফোঁটানোই আমার মত অন্যান্য যুবকদের উদ্দেশ্য। দেখো না! আমরা আন্দোলন করছি, অথচ বাইরে কত কিছু আলাপ আলোচনা চলছে।

“বিপ্লবীরা কখনো মিলাতে যায় না কভু চাওয়া-পাওয়ার সমীকরণ
বিপ্লবীদের নিষ্প্রয়োজন আন্দোলনের সুফল সুবিধা।
তাঁরা বেঁচে থাকে স্মৃতিতে অনাদিকাল
নিঃস্বার্থভাবে তারা করে বিপ্লব
স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য দেয় অকাতরে প্রাণ বিসর্জন।
ভয় করে না সাউন্ড গ্রেনেডের কোন উপঢৌকন
টিয়ারগ্যাস যেন গ্রামীণ চুলার ধোঁয়া।
তাঁদের অসীম সাহসিকতায় কুর্নিশ করে হিমালয়
অত্যাচারীর দম্ভ নিমিষেই চুরমার নিশ্চয়।
পিছুটান হতে বাধ্য একসময়।”

বাংলাদেশ বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য নেতৃত্বদানকারী সকল মানুষের অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। রাষ্ট্র চায় সবসময় তার নাগরিক ভালো থাকুক। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসক ও দলীয় প্রধান নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সবসময় জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করে। আমি ও আমার

সহপাঠীরা এ বিষয়টি মেনে নিতে পারি না। আমরা ক্লাসে, সভা-সেমিনারে বিভিন্ন আলোচক ও গুরুজনদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করি। যদিও আমাদের উত্তর কখনো কখনো সন্তোষজনক হয় না। আমি চাই রাষ্টের সকল মানুষ একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে চলবে। কারণ নাগরিক তার দায়িত্ব পালন করলে রাষ্ট্রকে একটি সুখী সমৃদ্ধি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। আসলেই কি এটা সম্ভব ? নাকি আমাদের এ স্বপ্ন কখনো পূরণ হওয়ার নয়?

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আমার সহপাঠী, বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্যদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও শুরুতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। পরবর্তীতে অনেকে আমার বিদ্রোহী মনোভাব এবং প্রতিবাদী কন্ঠস্বরের কারণে পছন্দ করতো না। পড়া লেখার পাশাপাশি আমি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করির। আমার এ বিদ্রোহী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কারণে অনেকেই আমাকে পছন্দ করতো।

গুলবাহার রেশমি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মাঝেমধ্যে আমাদের উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে বিতর্ক ও বঙ্গানুবাদ হতো। গ্রন্থগারের সামনে বিকেলে চা খেতে বের হলে এ বিষয়ে তার সাথে আমার আলাপ আলোচনা চলতো। গুলবাহার রেশমি কিছুটা আধুনিক ও বাস্তববাদী এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কিত বিষয়াবলী নিয়ে ততটা সোচ্ছার ছিলো না। যদিও তার বান্ধবী এ্যানি রয় এবং রাবেয়া চৌধুরী এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলো। তারা নিয়মিত আমার মত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে যোগ দিত। গুলবাহার রেশমি আমার সামাজিক সচেতনতা এবং বিদ্রোহী মনোভাব পছন্দ না করলেও তার চারিত্রক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলো।

একদিন হঠাৎ আমি গুলবাহার রেশমিকে পরিণয়ের প্রস্তাব দেই। যদিও এটা শুনে সে রীতিমত হতবাক হয়ে পড়ে। কারণ সে বিয়ে-শাদিতে এখনই ইচ্ছুক নয় বলে জানায়। সে এখন পড়ালেখা ও ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। অন্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করার তার একদম ফুসরত নেই। তাছাড়া আমাকে যে তার তেমন একটা পছন্দ করে না, তা বিভিন্নভাবে সে বুঝিয়ে দেয়। তবে সে একদিন প্রশ্ন করে বসলো যে, তুমি আমাকে কেন পছন্দ কর?

আমি বললাম যে তোমার ভিন্ন মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি আমার ভালো লাগে। এছাড়াও তোমার দেশের ও সামাজিক বিষয়ে অনীহা আমাকে পীড়া দেয়। এক সময় তোমারও এ সকল বিষয়াবলির প্রতি আরো আকৃষ্ট হবে। আমি বললাম আমি এমন জীবন সঙ্গিনী খুঁজছি যাকে আমি আমার মাতৃভূমি ও রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে বুঝবো। তুমিও এক সময় এ দেশ ও মাটিকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসবে। এ সকল বিষয়ে তোমার সচেতনতা আরো বাড়বে।

আমাদের এ একাডেমিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক বহু সময় ধরে চলতে থাকে। ধীরেধীরে আমরা উভয় উভয়কে পছন্দ করতে শুরু করি এবং ভালো লাগা কাজ করে। এক সময় কাকতালীয়ভাবে আমরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পণ করি। তবে গুলবাহার রেশমির পক্ষ থেকে আমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি সামনে আনা হয় এবং বর্তমান দেশের অচলাবস্থা শেষ হলে বিয়ে শাদির বিষয়ে সিরিয়াস হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেয়। বর্তমানে আমরা উভয়েই উভয়ের পড়ালেখা ও ক্যারিয়ারের ওপর ফোকাস করার সিদ্ধান্ত নেই।

গুলবাহার রেশমি আমার পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে জানতো। সে বললো যে, “তোমার এবং তোমাদের সংসার চালানো খুবই কষ্টকর।” আমি তাকে বললাম, এটা স্বাভাবিক বিষয়। সে আমার আর্থিক অবস্থার তুলনায় বিত্তবান ছিলো। আমি আমার খরচ মূলত টিউশন এবং ফ্রি-ল্যান্সিং আয়ের মাধ্যমে কোনমতে চালিয়ে নিতাম। ব্যতিক্রম ছিলো আমার বন্ধু মীর কণক। সে এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল। সে পরিবারের অন্যান্য সদস্যেদের নিকট আর্থিক সহায়তা নিতো। এ ব্যাপারে তার পরিবার

থেকে অর্থ সহায়তা পেতে যাতে চাপ না দেয় সে বিষয়ে আমি সবসময়ই পরামর্শ দিতাম। কারণ সে মনে করতো পরিশ্রম করে নিজে চলা এবং সংসারকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা একজন ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশের নানা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সমসাময়িক আন্দোলন কর্মসূচিতে আমি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলো।

আমি প্রায় সময়ই গুলবাহার রেশমির সাথে আন্দোলন ও সংগ্রাম নিয়ে আলাপচারিতা করতাম। আমার কাছে অল্প সময়ে সে সব খবর পেয়ে যেতো। সে মনোযোগ দিয়ে আমার আলোচনা শোনতো। আমি তাকে অন্যান্য কথা-বার্তার তুলনায় বিপ্লব নিয়েই বেশি বলতাম । কারণ, আমার কাছে বিপ্লবই প্রেম, বিপ্লবই দ্রোহ ও বিরহ। আমি বললাম, শুনো গুলবাহার! বিপ্লবীরা সবসময় জন্মায় না। তাদের জীবন্ত সাক্ষাৎও সবার নসিবে ঝোটে না। তারা কোন এক শতাব্দির শুরুতে কিংবা শেষে কিংবা বহু যুগ পর জাতির ক্রান্তিলগ্নে হাজির হয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। তাঁরা তাঁদের জীবন অনায়াসে বিলিয়ে দেয়। তাঁদের সম্মুখে মরণাস্ত্র এবং অন্যান্য হুমকি কিছুই না। সে বললো যে, তোমার এ রোমান্টিক বিপ্লব আমার কাছে অসাধারণ লাগে।

দেশের প্রতি অতি মাত্রায় ভালবাসা, একাডেমিক মনোযোগ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে গুলবাহার রেশমির সাথে আমার দূরত্ব বাড়তে থাকে। সে জিজ্ঞেস করে দেশের প্রতি এত ভালবাসা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা দেখিয়ে লাভ কি? কারণ তোমার বিপদে তো আর কেউ এগিয়ে আসবে না! আমাদের ছোট জীবনে এত ঝামেলায় পড়ার কোন মানে হয় না। আশে পাশে দেখো না! কত কিছুই তো ঘটছে। তোমাকে একটা বিষয় তাহলে বলেই ফেলি।

দেখা না! অনেকে এত বেশি পরিমাণ খাবার পায় যা তারা অনায়াসে অপচয় করে। আবার অনেকে এত বেশি পরিমাণ খায় যে, নড়াচড়া করতে পারে না। গলা পর্যন্ত খাবার ওঠে আসে এবং বিভিন্ন পানীয় খেয়ে তা হজমের চেষ্টা করে। আর আমাদের মত মধ্যবিত্তদের সামান্য পরিমাণ খাবার কিংবা তিন বেলা ঝুটাতে কষ্ট হয়। সম্পদের সুষম বন্টন, নাগরিক সুবিধা, ধনী-দারিদ্রোর বৈষম্য হ্রাস করা না গেলে তোমার এ রাজনৈতিক আন্দোলন কোন কাজে আসবে না। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে রীতিমত মান-অভিমান চলতো।

হঠাৎ এক সময় অচলাবস্থার অবসান ও বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। মাহমুদ আমাকে গুলবাহার বলেই ডাকতো। মাহমুদের সাথে আমার পরিচয় জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক ও ট্রাজেডির একটি দিক। আমার পুরো নাম তার খুব পছন্দ ছিল। তাকে নিয়ে আমার অনেক গল্প ও কবিতা জমা আছে। কার কাছে তা বলবো?

বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয় জুলাই বিপ্লবের বিজয়ের সুর। জুলাই মাসের শুরুতে তার সাথে আমার সর্বশেষ কথোপকথন হয়। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে আর যোগযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দেশের অবস্থা তখন মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছে যায়। অবশেষে ৩৬ শে জুলাইও তার সাথে আমি যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হইু।

মাহমুদ তার সহপাঠীদের নিকট বিভিন্ন দেশি-বিদেশি কবিতায় আবৃত্তি করতো। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, কবিতা, গান ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে যেভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা যায়, সেটা আর অন্য কারো মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ প্রাঞ্জল কথা ও কবিতায় আমার মধ্যে তার প্রতি ভীষণ প্রীতি বাড়িয়ে দেয়। আজকে আমার প্রতি লেখা একটি চিঠি থেকে মাহমুদের একটি কবিতা তুলে ধরছি।

"যুগে যুগে বিপ্লবীরা হাজির হয় কান্ডারীর মতন
মানবসেবায় তাঁরা নিজেদের বিলিয়ে দেয় সবসময় ।
মহাকাল সমুদ্রের মোহনায়

তাঁরা স্থির হয়ে রয় অকুতোভয় এক সারথী।
রক্তের বন্ধনের চেয়ে এ বন্ধন সুদৃঢ়।
বিশ্বের আপামর জনতা তাদের সবসময় করে স্মরণ।
শ্রেণি বৈষম্য রোধে তাঁরা আজ ঐক্যবদ্ধ
স্বজাতির জন্য করে তাঁরা প্রাণবিসর্জন
রুখে দাও
রুখে দাঁড়াও
মনুষ্যত্ব জাগরণে তারুণ্যের উদাত্ত আহ্বান।
অবশেষে বিজয়ের মিছিল আসবে সর্বত্র
স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে খুশির বন্যায় হবে প্লাবিত
নতুন বাংলাদেশে হবে বৈষ্যম্যের অবসান
আকাশে-বাতাসে বইবে আনন্দের জোয়ার।”

বাসায় বসে আমার কিছুই ভালো লাগছে না। তারপর আমি মাহমুদের দেওয়া শাড়িটি পরিধান করে পরিপাটি হয়ে বের হই সাক্ষাতের আশায়, যেখানে আমরা প্রায় সময়ই মিলিত হতাম। আমি রিক্সায় করে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আজ যে, কোন পরিবহন চলছে না। সবাই বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করছে এবং বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই আমি পদযাত্রা শুরু করলাম। আমাদের মিলিত হওয়ার স্থানে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও তার সাক্ষাৎ পেলাম না। বিজয় বেশে সবাই ফিরে আসলেও আমি তার আর কোন খুঁজ পেলাম না।

“মুখ খানা দেখিবার তরে
ঘুরে বেড়াই আজও পথে ঘাটে
জুলাই আগাস্ট আসে ঘুরে ফিরে
প্রিয়জনের সাক্ষাৎ অধুরাই থাকি
চিত্তে রক্তক্ষরণ চলছে
কুমারের মাইয়া কান্দেরে
আজি কালির মইধ্যে দেখিবার আশায় থাকে
অভাগার মরণ লিখলো কেরে!
অভাগিনীর কান্দনে বুক ভাসে
বিয়ার কতা যায় অপূর্ণ রয়ে
ঢ্যানার জন্য রাজকন্যা কান্দে
কৈতর হয়ে গাবরু উড়ে বাহে
রাজা যায় রাজা আসে
হামার বন্ধু বাড়িত নাইরে।”

অবশেষে আমি একটি রিক্সা খুঁজে পেলাম। আমি দেখছি, আজ বাংলাদেশ নতুনভাবে চলতে শুরু করছে। নতুনভাবে এ দেশ চলতে শিখছে। অগণিত বিপ্লবী, সাংবাদিক, পথচারী, শ্রমিক, এবং সাধারণ মানুষ তার প্রিয়জনকে হারিয়েও বিজয়ের স্লোগান দিচ্ছে। আমি পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে দেখছি। শুধু একজনকে আমি ভীষণভাবে দেখার চেষ্টা করছি। কিন্ত আমি মাহমুদকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কি আদৌ তাকে খুঁজে পাবো? আমি আমাদের অসমাপ্ত কাজ ও ওয়াদা পরিপূর্ণ করতে পারবো? আমি মাহমুদের স্বপ্নের বৈষম্যহীন সমাজ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বাংলাদেশ দেখতে পাবো?

বৈষম্যরোধে দিচ্ছে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন।
মৃত্যুর মিছিলে শামিল হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ নেহাত কম বিপ্লবীর ভাগ্যে
এ যেন পরমাত্মার মিলনে অমর হওয়ার সুযোগ কতিপয় মহাআত্মার
বীর শহিদুল ইসলাম লালুর সাথে মিলিত হয়েছে অজানা কত শহীদ তাহমিদ তামিম !
সাম্য, মানবিক মর্যাদা কিংবা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তারা অতন্দ্রপ্রহরী
কত মায়ের বুক আজ খালি হল তা ভেবে দেখেছো কি তুমি!
জন্মদাতার রোনাজারিতে সমীরণে ঝড়
আল্লার আরশসহ এ ভূখন্ড প্রকম্পিত।
মীর মুগ্ধর নানা উক্তি বিপ্লবীর স্লোগানে রুপান্তরিত।
শহীদ আবু সাঈদের বুক পাতার দৃশ্য স্মৃতিতে করছে রক্তক্ষরণ
বীরের মত শহীদ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল অকুতোভয় বীর
দেশে বিদেশে তার বীরদর্পে লড়াইয়ের দৃশ্য সর্বত্র সয়লাব
অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করার প্রতিচ্ছবি।
অগণিত বীরের গল্প এ বাংলায় ভরপুর।
আবু সাঈদ যেন বিপ্লবের প্রতীক চে গুয়েভারা
তাঁর বীরত্ব যেন মহাকাব্যের উপাখ্যান
বিজয় মিছিলে উত্তাল রাজপথ।”

জুলাই বিপ্লব
বাংলার নতুন সূর্য উদিত

মাসুদ পারভেজ*

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট যা ঘটে গেছে, তা অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন। কারফিউ দিয়ে সেনাসদস্যদের নামিয়ে, ইন্টারনেট বন্ধ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি সরকার। রাস্তায় রাস্তায় ধ্বংস চিহ্ন দৃশ্যমান। বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সেইসব ধ্বংস চিহ্নকে হয়তো মুছে ফেলা যাবে। একদিন সেটা মুছেও যাবে। কিন্তু যে মায়েদের বুক খালি হলো, যে শিশুরা বাবা হারাল, যে বোনেরা তাঁদের ভাইদের হারালেন, যে কিশোর-তরুণরা তাঁদের বন্ধুদের হারাল, সেসব স্বজনহারা ও বন্ধুহারা মানুষের ক্ষতচিহ্ন কেউ কখনো কি নিরাময় করতে পারবে? কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ-সহিংসতায় নিহত প্রায় নয় শতাধিক এবং আহত হয়েছে প্রায় ২০ হাজার। এদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হওয়া মানুষ যেমন আছে, তেমনি আবার অঙ্গ হারিয়ে পঙ্গু হওয়া মানুষও আছে।

১৯৪৭ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোনো আন্দোলনেই মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে এত প্রাণহানি আর হয়নি। কোটা সংস্কারের মতো যৌক্তিক একটা দাবির প্রেক্ষাপটে দেশজুড়ে কেন এমন অভাবনীয় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল? সেটা নিশ্চিতভাবেই সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হবে। তবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ- দুইয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ আন্দোলনে। যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের একটা বড় অংশ শিক্ষার্থী ও তরুণ, রয়েছে শিশু-কিশোরেরাও। তাঁরা যে সবাই মিছিলে গিয়েও বিক্ষোভ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন, তা নয়। কেউ পড়ার টেবিলের পাশের জানালায় দাঁড়িয়ে, কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। জীবন যাদের এখনো শুরুই হয়নি, তারাও আজ নির্মমতার শিকার হয়ে আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেল।

ঢাকার মিরপুরের ১১ বছরের শিশু সাফকাত সামিরের কথাই ধরা যাক। ১৯ জুলাই দুপুরে মিরপুরে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘাত চলছিল। বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। সেই ধোঁয়া ঘরের মধ্যে ঢুকলে জানালা বন্ধ করতে যায় সামির। গুলি এসে তার চোখ ফুঁড়ে মাথায় বিদ্ধ হয়। সামির তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। নারায়ণগঞ্জের সাড়ে ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপ। দুপুরে খাওয়ার পর খেলতে গিয়েছিল ছাদে। বাড়ির সামনে সংঘর্ষ বাধলে বাবা দীপক গোপ দৌড়ে গিয়ে মেয়েকে ছাদ থেকে আনতে যায়। ভয় পাওয়া শিশুটিকে কোলে তুলে নিতেই বুলেট এসে বিঁধে তার মাথায়। তিন দিন হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুর কাছে হেরে যায় শিশুটি। মা-বাবার কোল তো শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। সেখানেই জীবন শুরু না করা একটা শিশু কেন গুলি খেয়ে মারা যাবে?

রিয়া তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। এর চেয়ে নির্মম প্রতীক আর কী হতে পারে! কিশোর মোবারক ঢাকার পান্থপথের বক্স কালভার্ট এলাকায় গরুর খামার বস্তিতে মা-বাবার সঙ্গে থাকত। চারটা গাভি ছিল তাদের। সেই গাভির দুধ বিক্রি করেই সংসার চলত। ক্রেতাদের বাসায় দুধ পৌঁছে দিতে ২১ জুলাই দুপুরের পর বের হয়েছিল মোবারক। গ্রিনরোডে সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে মাথায় গুলি লাগে তাঁর। মাত্র তেরোতেই থেমে গেল তাঁর জীবন। দশম শ্রেণির নাইমা সুলতানা। ঢাকার মাইলস্টোন কলেজে পড়ত। উত্তরার ৫ নম্বর সড়কের ভাড়া বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ গুলি এসে বিদ্ধ হয় নাইমার মাথায়। নাইমার মা আইনুন্নাহারের প্রশ্ন, 'আমার বুকের ধনটারে কে

---

* লেখক ও গবেষক।

এমনে মারল? কী কারণে মারল? আমি এখন কী নিয়ে বাঁচব?' ঘর মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। সেখানেই কেন প্রাণ হারাতে হলো মাত্র ১৫ বছরের কিশোরীকে?

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ফারহান ফাইয়াজ, যে তার ফেসবুক ওয়ালে লিখেছিল, 'এমন জীবন গড়ো, যাতে মৃত্যুর পর মানুষ মনে রাখে'। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর আলোয় চোখ রাখা ফারহানের বয়স আঠারোও হয়নি। মুখ ও বুকে রাবার বুলেটের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে হারিয়ে গেছে ফারহান। একের পর এক বিয়োগান্ত ঘটনা সামনে আসে আর শোকে, বিহ্বলতায়, হতাশায়, ভয়ে আমরা মুষড়ে পড়ি, আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। জুলাই আন্দোলনে সারা দেশে যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, তাতে শিশু ও ছাত্র নিহত হয়েছে।

নরসিংদীতে যে দুজন শিক্ষার্থী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন, তাঁদের মধ্যে তাহমিদ তামিমের বয়স মাত্র ১৫ বছর, ইমন মিয়ার বয়স ২২ বছর। মাদারীপুরে পুলিশ ও ছাত্রলীগের ধাওয়ায় পুকুরে ডুবে নিহত শিক্ষার্থী দীপ্ত দে'র বয়স ২১ বছর। জুলাই আন্দোলন এ রকম অসংখ্য মৃত্যু, অসংখ্য পরিবারের জন্য অন্তহীন ট্র্যাজেডি হয়ে থাকবে। এভাবে শিশু ও ছাত্রের নিহত হওয়ার ঘটনা যে ব্যক্তি-পরিবার ছাপিয়ে সামাজিক ট্র্যাজেডিও হয়ে ওঠে এবং সেটা যে সামষ্টিক বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়, জুলাইয়ের আন্দোলন তার ধ্রুপদি উদাহরণ।

বিশ্বের আর কোথাও কিশোরদের ও ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রশমনে এমন বাড়াবাড়ি রকম বলপ্রয়োগ ও নির্বিচারে গুলি করা হয় কি না? এমন করে পেটোয়া বাহিনীকে মাঠে নামিয়ে শত শত শিক্ষার্থীকে রক্তাক্ত করা হয় কি না। নিশ্চিতভাবেই আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, সরকারের যাঁরা নীতিনির্ধারক, তারা কোন সদুত্তর দিতে পারবে না। তাঁদের সঙ্গে এই প্রজন্মের শুধু বয়স নয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ফলে বলপ্রয়োগ, উপহাস, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাদের দমিয়ে দেওয়া যাবে না।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্টের পর ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাল, অনেক বেশি জোরালোভাবে। প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পিটিয়ে সোজা করার জন্য সারা ঢাকা থেকে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের পেটোয়া বাহিনী আনা হয়। তারা লাঠিসোঁটা, হকিস্টিক, দা, পিস্তল নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারী শিক্ষার্থীদের বেপরোয়াভাবে পিটিয়ে আহত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর ব্যাপক, বেপরোয়া হামলার খবর, ছবি ও ভিডিও অনলাইনের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য ঘিরে সৃষ্ট হওয়া বিতর্কের পর এই হামলা এবারের আন্দোলনের দ্বিতীয় টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এর ফলে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সংহতি তৈরি হয়। ফলে মাসখানেক আগে জন্ম নেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচিতে ঢাকার অভিজাত এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সারা দেশের গ্রাম-মফস্বলের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও রাস্তায় নেমে আসে এবং প্রতিবাদে শামিল হয়।

রংপুরের একেবারে গরিব পরিবারের ছেলে আবু সাঈদের মৃত্যু সারা দেশের মানুষের মধ্যে গড়ে দেয় অভূতপূর্ব এক সংহতি। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ এবং লুঙ্গি পরা লোকেরা নেমে আসেন রাস্তায়। মাসের পর মাস ধরে চলতে থাকা উচ্চ মূল্যস্ফীতি, সীমাহীন দুর্নীতি ও বৈষম্য, জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে যাওয়া, ভোট দিতে না পারা, তরুণদের বেকারত্ব, বস্তি থেকে উচ্ছেদ এবং হকারি করতে গিয়ে চাঁদাবাজির শিকার হওয়া খেটে খাওয়া মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে মিলে যায়।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে করোনা মহামারি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দেশের গরিব, নিম্ন আয় ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষেরা কী দুর্বিষহ ও লাঞ্ছনার জীবনযাপন করছেন, তা কি কারও অজানা? শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এক সময় নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করেছিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করেছিল, কিন্তু ক্ষমতায় এসেই সেই আওয়ামী লীগ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন করেছে বিরোধী দলের বর্জনের মুখে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ রাতের ভোট নামে পরিচিত এক পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারির ভোটে মাঠের বিরোধী দল বিএনপি ছিল না। আওয়ামী লীগ নিজেদের দলের লোকদেরই ডামি প্রার্থী করে ভোটের আয়োজন করে। শেখ হাসিনা দলের ভেতরে নিজের ন্যূনতম বিরোধিতা এড়াতে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনীতি করা নেতাদের কোণঠাসা করে রেখেছিলেন। সামনে এনেছিলেন অনুগত নেতাদের। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আওয়ামী লীগ জনগণের কাছ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, পুলিশ ও আমলানির্ভর, দুর্নীতিবাজে ঘেরা একটি দল।

যে শেখ হাসিনা এক সময় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলেন, পরে তিনিই পরিচিত হন গণতন্ত্র হত্যাকারী হিসেবে। শেখ হাসিনার ওপর এখন ছাত্রহত্যার দায়। নয় শতাধিক মানুষ হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি বিদায় নেন।

পরিস্থিতি থিতু হয়ে আসতে শুরু করায় সরকারের তরফ থেকে মূলত 'ষড়যন্ত্রতত্ত্ব' সামনে আনা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, নাশকতা, সহিংসতা করার জন্য কোনো গোষ্ঠী যখন পরিকল্পনা করেছে, প্রস্তুতি নিয়েছে, তখন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কী করেছে? ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর 'রহস্যের উদ্‌ঘাটন' শেষ বিচারে কোনো অর্থ বহন করে কি? এলাকা ঘিরে ব্লক রেইড আর গণগ্রেপ্তারই যখন সরকারের কাছে একমাত্র সমাধান হয়ে দাঁড়ায়, তখন রাজপথেই সমাধান মুখ্য হয়ে ওঠে।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিল করে পুনর্মূল্যায়ন চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ও দুই সাংবাদিকের পক্ষে রিট দায়ের করেন আইনজীবী এখলাছ উদ্দিন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের এক নির্বাহী আদেশে সরকারি, বেসরকারি, প্রতিরক্ষা, আধা সরকারি এবং জাতীয়করণ করা প্রতিষ্ঠানে জেলা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা ও ১০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য কোটা প্রবর্তন করা হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে কোটায় সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয়। সব মিলিয়ে ৫৬ শতাংশ কোটা বিদ্যমান থাকে। ফলে যাঁরা কোনো কোটায় পড়েন না, তাঁদের প্রতিযোগিতা করতে হতো বাকি ৪৪ শতাংশের জন্য।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি, সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটাব্যবস্থা সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন করে দুটি পক্ষ। বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র সংরক্ষণ পরিষদের' ব্যানারে কয়েকশত চাকরিপ্রার্থী কোটা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। আর সংস্কার প্রস্তাবের নামে 'মুক্তিযোদ্ধা কোটার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের' প্রতিবাদে মানববন্ধন করেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের নেতা-কর্মীরা। তবে পুলিশ সেখানে কাউকেই দাঁড়াতে না দেওয়ায় আন্দোলন চালিয়ে নিতে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সাধারণ ছাত্র সংরক্ষণ পরিষদ ৭১ (একাত্তর) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। একই বছর ৯ এপ্রিল, সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাকরিপ্রার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৫ ফেব্রুয়ারি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

এরপর ৪ মার্চ মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে আন্দোলনকারীরা ১৩ মার্চ পর্যন্ত সরকারকে কোটা সংস্কারের সময়সীমা বেঁধে দেয়। আন্দোলনকারীদের পাঁচ দফা দাবির মধ্যে ছিল কোটাব্যবস্থা সংস্কার করে ৫৬ ভাগ থেকে ১০ ভাগে নিয়ে আসা, কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে শূন্য থাকা পদগুলোতে মেধায় নিয়োগ দেওয়া, কোটা ব্যবস্থায় কোনো ধরনের বিশেষ নিয়োগ পরীক্ষা না

রাখা, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সবার জন্য অভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারণ এবং চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা-সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার না করা। এদিন কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে বেলা দুইটার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে হাজারো শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থী গণপদযাত্রা করে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে বেলা তিনটায় শাহবাগ মোড়ে এসে অবস্থান নেয়। আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দেয়, জাতীয় সংসদের অধিবেশন থেকে ঘোষণা না আসা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাবে। রাত পৌনে আটটায় আকস্মিকভাবে শিশু পার্কের দিক থেকে ১৫-২০ প্লাটুন দাঙ্গা পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে করতে শাহবাগ মোড়ের দিকে আসতে থাকে। তারা আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিপেটা শুরু করে। পুলিশের আকস্মিক হামলায় আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে দুই ভাগ হয়ে যান। এরপর থেকেই মূলত আন্দোলন ঘিরে সহিংসতা শুরু।

বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র সংরক্ষণ পরিষদের নেতাদের ওপর বারবার হামলা করে ছাত্রলীগ। ফলে আন্দোলন ক্রমশ সহিংস হয়ে ওঠে। ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৪ অক্টোবর কোটা প্রথা বাতিল প্রসঙ্গে পরিপত্র জারি করে সরকার। এরপর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এই পরিপত্র বাতিল চেয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান রিট দায়ের করে। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রুল দেয়। রুলে ওই পরিপত্র কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না? সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায়। ৬ জুন সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহালে আদালতের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ। ৯ জুন সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন। এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা দেয় তাঁরা। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয় ১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিল জেনারেশন জেড যারা সংক্ষেপে জেন জি নামে পরিচিত। জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের মতো এত মৃত্যু দেখেনি বাংলাদেশের মানুষ। অতীতের আন্দোলনের মতো সামনের সারিতে ছিলেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনে বড় অংশগ্রহণ ছিল নারী শিক্ষার্থী। আরেকটি দিক হলো, লড়াই হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও। বেশিরভাগ টেলিভিশন চ্যানেল যখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে, অনলাইন মাধ্যমগুলো চাপে, তখন শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ ও আন্দোলনের আদর্শিক লড়াইয়ের পথ হয়ে ওঠে ফেসবুক ও টুইটার। সেখানে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ, স্বজন হারানোর বেদনা, পুলিশের গুলি করার ভিডিও চিত্র। তাতে যুক্ত করা ছিল মুক্তিযুদ্ধের গান ও দেশপ্রেমের গান। নতুন নতুন স্লোগান ও দেওয়াল লিখন। তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ এই প্রজন্ম তাঁদের লড়াই তাদের মতো করে করেছে। তাদের ঠেকাতে বারবার ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে। কখনো কখনো ইন্টারনেট চালু থাকলেও বন্ধ রাখা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তবে শিক্ষার্থীদের দমানো যায়নি।

বিস্ময়করভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন আক্রান্ত হলেন, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসেন। অতীতের আন্দোলনে সভা সমিতির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ তৈরি হতো। নতুন প্রজন্ম সেটা তৈরি করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। অনলাইন জগতে তাঁরা যেহেতু বিশ্বনাগরিক, সেহেতু তাঁরা আইনের শাসন, মানবাধিকার,

ন্যায়বিচারের অভাব বোধ করেন। এর উৎস শেখ হাসিনা সরকারের গত ১৫ বছরের শ্বাসরোধী স্বৈরাচারী শাসনকাল। শেখ হাসিনা নির্বাচন ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনকে কঠোর থেকে কঠোরতর করে তোলেন। তাঁর শাসনামলে বিরোধী দল ও কণ্ঠকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যুব্জ করা হয়, অবরুদ্ধ করা হয় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। এ সময়ে ছয় শতাধিক মানুষকে গুম করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৭০ (একশত সত্তর) জনের বেশি লোককে খুজে পাওয়া যায়নি। গণমামলায় আটক বা দুর্বিষহ অবস্থায় ছিলেন বিরোধী দলের অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী। এ সময়ে দুর্নীতি, স্বজন-তোষণ, ব্যাংক লুট আর বিপুল অর্থ পাচারে দেশের অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। অর্থনীতির প্রবল নিম্নচাপে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত।

এই গণজাগরণে তারই পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে, যার অনিবার্য পরিণতি শেখ হাসিনার গত ১৫ বছরের অপশাসনের বিদায়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন ছাত্রশক্তির অভ্যুদয় লক্ষ্য করলাম। শিক্ষার্থীদের প্রজ্ঞা, সাহস ও নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে সফল করে তুলে। সারা দেশের জনতা নির্ভীক চিত্তে যেভাবে এ আন্দোলন বেগবান করে তুলল। একটি নতুন যুগের উন্মেষ ঘটাতে এ সময়ে যাঁরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিল, জাতি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের জন্য আমরা একই সঙ্গে শোকে শোকাহত এবং গর্বে উন্নতশির। আপামর জনতা একটি কঠিন রক্তস্নাত অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অপশাসনের জগদ্দল পাথরকে ভেঙে চূর্ণ করেছে। এই আন্দোলন নতুন যে প্রতিশ্রুতি বয়ে এনেছে, তাকে সফল করে তুলতে হলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে নবীনতার মিলন ঘটাতে হবে। দেশের প্রাজ্ঞ নাগরিক-সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নতুন ছাত্রশক্তির সংলাপের ভিত্তিতে সামনের দিনের পথ রচিত হোক। এবার জনগণের অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ভিত্তিতে আমরা সার্বিক অর্থে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পেতে চাই।

৫ আগস্ট ভোরে যে সূর্য উদিত হয়, তা এক নতুন সূর্য। নয় শতাধিক ছাত্র-জনতার রক্তে সেটি রঞ্জিত। এই রক্তরঞ্জিত সূর্যের উদয় ঘটেছে এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। জুলাই-আগস্ট দেশ আক্ষরিক অর্থেই এক মৃত্যু-উপত্যকা পার হয়ে এসেছে। ১ জুলাই ছাত্ররা যখন সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটার অবসানের দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেটি তখন ছিল আপাদমস্তক অহিংস। কিন্তু প্রথমে শেখ হাসিনার দম্ভোক্তি ও একগুঁয়েমি এবং পরে নিরীহ ছাত্রদের ওপর তাঁর দল ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহিংস আক্রমণের কারণে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে পড়ে।

১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ শহিদ হলে তা পুরো দেশের হৃদয়ে আঘাত করে। শেখ হাসিনা মুখে সংলাপের কথা বললেও ছাত্র-জনতার ওপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চলতে থাকে। এই চরম নিষ্পেষণের প্রেক্ষাপটে ছাত্রদের সঙ্গে দেশজুড়ে যোগ দিতে শুরু করে সাধারণ জনতা-কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, শিক্ষক, আইনজীবী, অভিভাবক, নারীসমাজ, শিল্পী, শ্রমিক ও পেশাজীবীরা।

এই জনতার কাতারে বহু আওয়ামী বা বিএনপি অনুরাগী এবং বাম-ডান একাকার হয়ে যায়। এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ ভাসিয়ে নিয়ে যায় দেশকে। ছাত্রদের কোটাবিরোধী ৯ দফার আন্দোলন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফার আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু এই এক দফা আন্দোলনের পটভূমি ৩৬ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

আপামর জনতা একটি কঠিন রক্তস্নাত অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অপশাসনের জগদ্দল পাথরকে ভেঙে চূর্ণ করেছে। ভাঙার সময়কে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। এখন গড়ে তোলার সময়। শেখ হাসিনার দুর্নীতি-জর্জরিত একনায়কতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা বিজয় অর্জন করেছে। যে প্রতিহিংসার রাজনীতি দেশবাসীর কণ্ঠে চেপে বসেছিল, তার অবসান ঘটেছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে নানা গণ-অভ্যুত্থানে মানুষের স্বপ্ন আকাশচুম্বী হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে সেসব স্বপ্ন ভেঙেও পড়েছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের পবিত্র চুক্তি প্রতিটি সরকার চূর্ণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শক্তি। আমাদের হাতে এখন একটি সফল আন্দোলনের পতাকা উড়ছে। আমরা যেন একে ঠিকভাবে বহন করে সামনে এগিয়ে যেতে পারি।

আবু সাঈদের ফেসবুক পোস্ট

সাহিদ হাসান শাকিল*

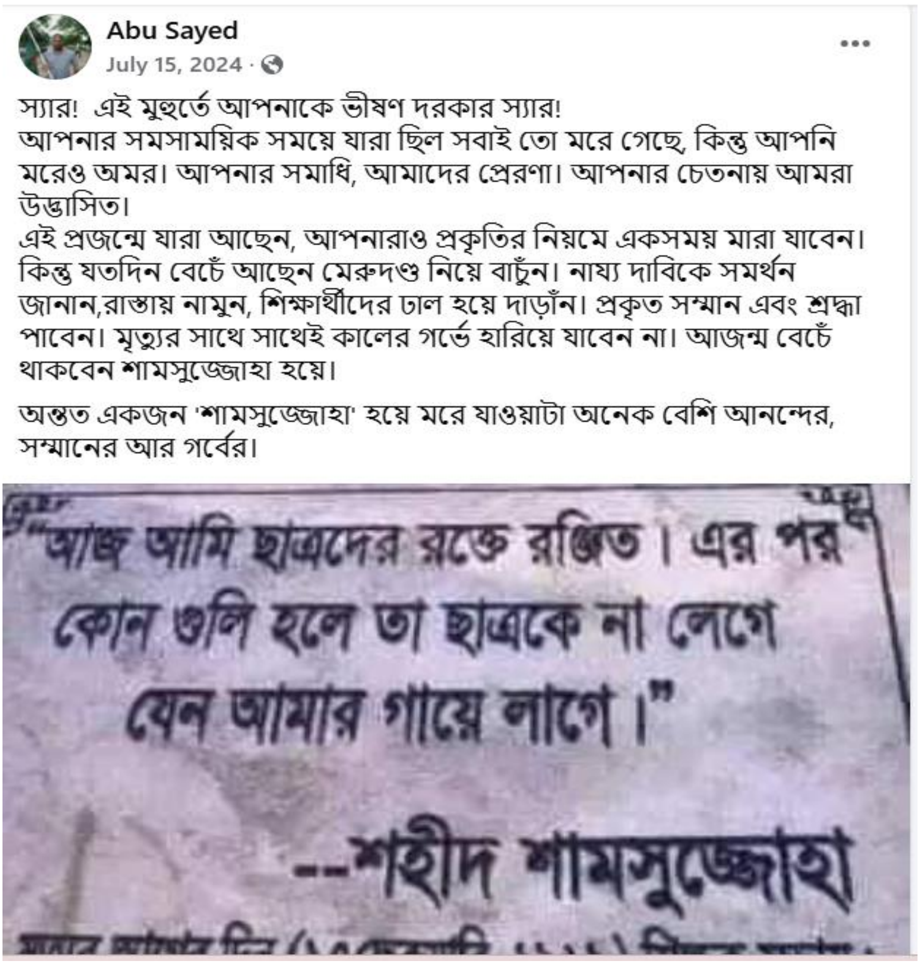

প্রেক্ষাপট: আমার কাছে মনে হয়েছে যে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সারাদেশব্যাপী কোটা সংস্কার আন্দোলন নতুন করে মাথা চাড়া দেয়। শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে দাবি উত্থাপন করলেও, দমনমূলক আচরণ, পুলিশি হামলা, গুলিবর্ষণ, এবং শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। এমন এক কঠিন সময়েই আবু সাঈদ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে প্রতিবাদ ও অনুপ্রেরণার বার্তা দেন।

---

* শিক্ষার্থী, একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

আমি এটাও মনে করি যে, এই পোস্টটি শহীদ আবুসাঈদের একটি চেতনার আগুন জ্বালানোর বার্তা। তিনি শিক্ষার্থী, সচেতন মানুষ এবং সমাজের বিবেকবানদের উদ্দেশ্যে এই পোস্ট করেছেন যেন তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখখুলে, শহীদদের সম্মান রক্ষা করে এবং ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে।

প্রেক্ষাপট: ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন চলছিল। সেই সময়ে সরকার পক্ষ থেকে দমনমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি নেগেটিভ প্রচার চালানো হচ্ছিল আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। যেমন, বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কোটা বিরোধী আন্দোলনকারীদেরকে পরক্ষভাবে রাজাকারের নাতিপুতি হিসেবে অবহিত করে ছিলো। শহীদ আবু সাঈদ এই পোস্টটি শেয়ার করেন দেখানোর জন্য যে দেশের সাধারণ মানষ-বিশেষ করে প্রবাসী বাবা-মারাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করছে এবং এর পেছনে একটি গভীর মানবিক ব্যথা ও দায়বদ্ধতা কাজ করছে।

এই পোস্টটিতে একজন বাবা লিখেছেন, যে “৪৯ বছর বয়সের বাবা হয়েও আমার সন্তানরা রাজাকারের সন্তানের উপাধি নিয়ে বাঁচতে চায়না।” এই বক্তব্যটি প্রজন্মের জোরালো মনোবলের

প্রতিফলন, যা শহীদ আবু সাঈদ শেয়ার করে দেখাতে চেয়েছেন যে আন্দোলন শুধু শিক্ষার্থীদের নয়- এটি সার্বজনীন এক প্রতিবাদ।

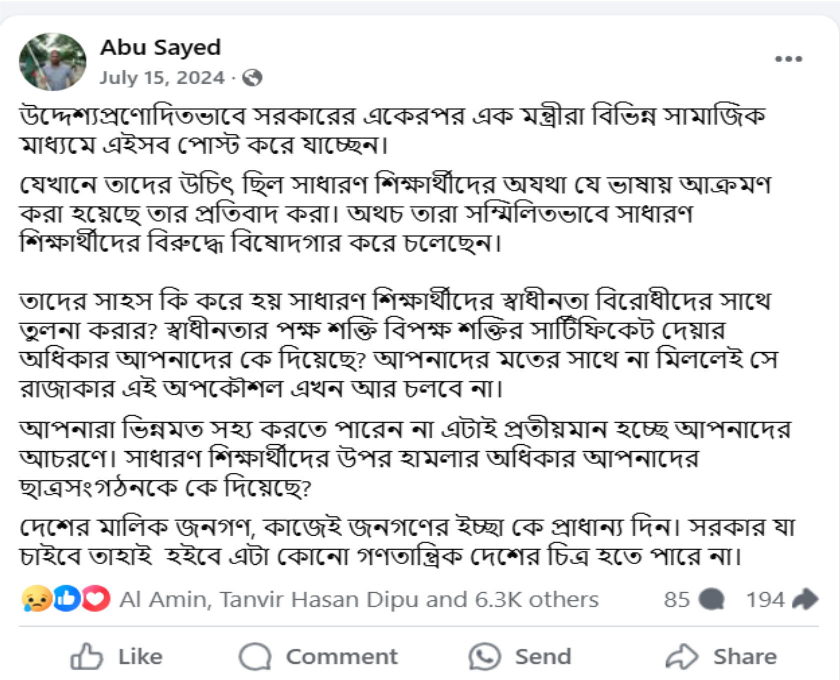

প্রেক্ষাপট: ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার এবং শাসক দলের কয়েক জন মন্ত্রী ও নেতাকর্মী সামাজিক মাধ্যমে ও জনসম্মুখে এমন কিছু মন্তব্য করেন, যেগুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থী, বিশেষ করে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অপমানজনক ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই ভাষ্যগুলোতে শিক্ষার্থীদের দেশ বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, এমনকি রাজাকারদের বংশধর বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

এমন অবস্থায় সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদের ঢেউ উঠে। শহিদ আবু সাঈদের এই পোস্ট সেই ধারারই অংশ, যেখানে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যেমন:-

সরকারি বক্তব্যের প্রতিবাদ জানানো:

পোস্টটিমূলত সরকারপন্থী মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে লেখা হয়েছে। শহিদ আবু সাঈদ এই ভাষ্যগুলোকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অসাংবিধানিক বলে মনে করছেন।

শিক্ষার্থীদের সম্মান রক্ষা:

শহিদ সাঈদ বলেছিলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে তুলনা করা চরম অন্যায় এবং তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন: কে কাকে স্বাধীনতার সার্টিফিকেট দেয়ার অধিকার দিয়েছে?

গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশেরঅধিকাররক্ষারআহ্বান:

তিনি এই পোস্টে মত প্রকাশের অধিকার, প্রতিবাদ করার অধিকার এবং ছাত্রদের সম্মানজনক অবস্থানকে প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা এবং তাদের দমিয়ে রাখার প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন।

ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবার্তা:

লেখক সতর্ক করে দিয়েছে যে, একটি স্বাধীন দেশের সরকার যদি নিজের জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে রোধ করে, তাহলে সেই দেশ আর গণতান্ত্রিক থাকেনা। বরং তা একনায়কতান্ত্রিক শাসনের দিকে এগিয়ে যায়।

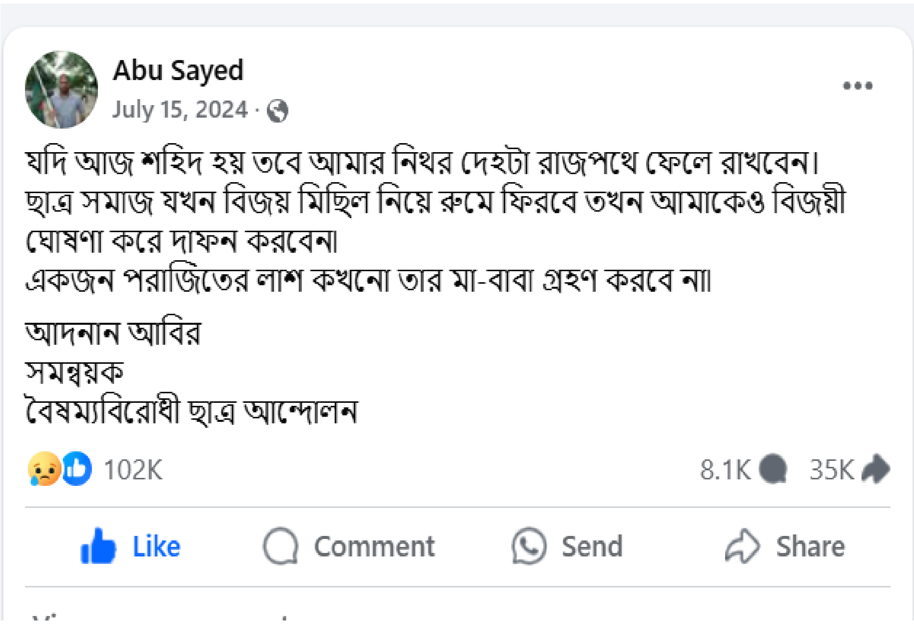

প্রেক্ষাপট: এই পোস্টটি এক ধরনের "আত্ম বলিদানের ঘোষণা" যা একটি গভীর হতাশা, প্রতিবাদ এবং আত্মত্যাগের মনোভাব থেকে এসেছে। পোস্টের প্রতিটি লাইনে রয়েছে রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান এবং ইতিহাসে নিজের অবস্থান জানিয়ে রাখার চেষ্টা।

পোস্টের মূল বক্তব্য:

এই কথার মাধ্যমে শহিদ আবু সাঈদ বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষের জীবনের প্রকৃত মূল্য সময়ের দৈর্ঘ্যে নয়, বরং নৈতিক অবস্থানে নিহিত। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার চেয়ে, ন্যায়ের জন্য লড়াই করে মৃত্যু বরণ করাও অনেক বেশি মর্যাদার।

পুন:পাঠ

জঙ্গিতত্ত্ব ফেরি করে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি

মাহমুদুর রহমান

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ গত প্রায় দেড় দশক ধরে বাংলাদেশকে একটি ইসলামী জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। শেখ হাসিনা গত মেয়াদে যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি অর্থব্যয়ে এদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান সম্পর্কিত পুস্তিকা ছাপিয়ে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ দূতাবাস মারফত বিতরণ করা হয়েছিল। এসব প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ২০০০ সালে বাংলাদেশ সফরে এলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় রাজধানীর পাশে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে যেতে পারেননি। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরও আওয়ামী লীগ সেই প্রচারণা অব্যাহত রেখেছিল।

আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাও দীর্ঘদিন ধরেই নানারকমভাবে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার রাষ্ট্রটি নিয়মিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সারা বিশ্বে বিশেষ পরিচিতি লাভ করলেও উল্টো তারাই আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশকে একটি ইসলামী জঙ্গিবাদী, সাম্প্রদায়িক ও অকার্যকর দেশ হিসেবে চিত্রিত করার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে থাকে। এদেশে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠতম মিত্র আওয়ামী লীগ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার শেষ উপায় হিসেবে দিলির ব্যবহৃত কৌশলই যে পুনর্বার গ্রহণ করেছে, সেটা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পেছনে কারা প্রকৃত দায়ী, সে বিতর্কে না গিয়ে একথা পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থন লাভের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতির ধারক-বাহকরূপে প্রচারণার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নিঃসন্দেহে লাভবান হয়েছে। আমাদের দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার।

প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন সর্বপ্রথম মাথাচাড়া দিলেও, অপরাধীদের দমনে চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদের প্রথম দিকের সিদ্ধান্তহীনতা দ্বারা আওয়ামী লীগই উপকৃত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সাল থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে এদেশে নব্বইয়ের দশকে সৃষ্ট সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ভেঙে দেয়া সম্ভব হয়।

আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ও সংসদে সরকারদলীয় হুইপ মির্জা আজমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাই ও তাদের সহযোগীদের বেগম খালেদা জিয়ার আমলেই গ্রেফতার ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। জেনারেল মইন ও ড. ফখরুদ্দীনের যৌথ নেতৃত্বাধীন ছদ্মবেশী সামরিক জান্তা পূর্ববর্তী সরকারের বিচার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ফাঁসি কার্যকর করে। তবে কিছু ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়া হলেও অনেক প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। দেশের প্রতিটি জেলায় প্রায় একই সময়ে এতগুলো বোমা স্থাপন এবং বিস্ফোরণ ঘটানোয় দেশি-বিদেশি মদতদাতা কারা ছিল? বোমার সরঞ্জাম কোন দেশ থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল? জঙ্গিগোষ্ঠীর অর্থায়নের পেছনেই বা কারা ছিল? বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সরকার তাদের শাসনের প্রায় চার বছরে সেসব রহস্য উদঘাটনে কোনোরকম

উৎসাহ না দেখিয়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অব্যাহতভাবে দেশে-বিদেশে জঙ্গিতত্ত্ব ফেরি করে চলেছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, ২০০৮ সালের নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের একচেটিয়া সমর্থন লাভে আওয়ামী লীগের এ-জাতীয় প্রচারণা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে গত পৌনে চার বছরের দুর্নীতি, জুলুম, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বাকস্বাধীনতা হরণসহ সার্বিক অপশাসনে গণবিচ্ছিন্ন মহাজোটকে তাই আবারও জঙ্গির গল্পেই ফিরে যেতে হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তৃতায় শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি সম্ভাব্য ইসলামী জঙ্গিবাদের দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন। পশ্চিমাদের কাছে নিজের অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন। শেখ হাসিনার বক্তৃতা দেয়ার সময় যে গুটিকয়েক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তারা বিএনপি-জামায়াতকে ঠিকমত না চিনলেও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার কল্যাণে জেনে গেলেন যে ষোলো কোটি মানুষের এই দেশটি জঙ্গিবাদের ঘাঁটি।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সরকারপ্রধান বিশ্বসভায় যখন নিজ দেশের প্রশংসা করেছেন, সে সময় শেখ হাসিনা দেশকে ডুবিয়ে কেবল নিজ পরিবারের গুণকীর্তনে ব্যস্ত ছিলেন। তার বক্তৃতার মর্মার্থ হচ্ছে, বাংলাদেশে একমাত্র আওয়ামী লীগ এবং ব্যক্তিগতভাবে তার পক্ষেই ইসলামী জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সুতরাং, তার সরকার অব্যাহতভাবে লুটপাট করে দেশের সর্বনাশ সাধন করলেও ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তাকেই সমর্থন করা আবশ্যক। ২০০৮ সালে অন্তরাল থেকে ভারত যেভাবে নানারকম প্রচারণা চালিয়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকে শেখ হাসিনার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, একমাত্র তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো গেলেই গাজীপুরমার্কা নির্বাচনী তামাশার মাধ্যমে মহাজোটকে আরও অন্তত পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় রাখা সম্ভব হবে। জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা দেয়ার দু'দিনের মধ্যেই এদেশে আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের প্রাথমিক বাস্তবায়ন দেখা গেল।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কয়েকটি স্থানে যে চরম নিন্দনীয় সাম্প্রদায়িক অশান্তির সূত্রপাত হলো, তার পেছনে ক্ষমতাসীনদের কারসাজি এবং বিদেশি শক্তির উস্কানি সমভাবে দায়ী বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শীর্ষপর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের ইসলামবিরোধী বক্তব্য এবং কর্মকাণ্ড দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে ক্রমেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। গত পৌনে চার বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে কোরআন শরিফ এবং মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননা করার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এক ব্যক্তি কোরআন শরিফ পরিবর্তনের আবদার নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট করার ধৃষ্টতা পর্যন্ত দেখিয়েছে। এর মধ্যে সংবিধান সংশোধন করে 'আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস' সেখান থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিউৎসাহী, আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রীদের বোরকা পরিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কথিত জঙ্গি দমনের নামে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা, গুম, রিমান্ডে নির্যাতন, বিনাবিচারে কারাবাসের রেকর্ড সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. গোলাম মাওলা নামের এক শিক্ষককে সুপ্রিমকোর্ট জামিন দেয়ার পর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাশিমপুর কারাগারের ভেতরে ডিবি পুলিশের লোকজন প্রবেশ করে আত্মীয়-স্বজনের চোখের সামনে থেকে তাকে অজ্ঞাতবাসে নিয়ে গেছে। পাঁচদিন গোপন স্থানে রেখে নির্যাতন করায় সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি হলে বানোয়াট মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে আবারও রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মেধাবী এই শিক্ষকের একমাত্র অপরাধ, তিনি নাকি হিযবুত তাহরির নামক একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কার্যকলাপ প্রধানত মার্কিন ও ভারতবিরোধী লিফলেট বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও বিদেশি প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে বর্তমান সরকারের আমলে তাদের

নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মরহুম হাফেজ্জী হুজুরের বড় ছেলে অসুস্থ বর্ষীয়ান আলেম শাহ্ আহমদউলাহ্ আশরাফকেও অত্যন্ত অমানবিকভাবে সরকার গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে। ইসলামী জঙ্গি দমনের কথা বলেই সরকার এভাবে নির্বিচার মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে সরকার সমর্থক মাওলানাদের মিছিল করতে কোনো রকম বাধা দেয়ার পরিবর্তে রীতিমত পুলিশি নিরাপত্তায় তাদের কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হচ্ছে।

সরকারের কৌশল এখানে অতি পরিষ্কার। আলেমদের মধ্যকার একাংশকে সরকারের পক্ষভুক্ত করে ভিন্নমতাবলম্বীদের জঙ্গি আখ্যা দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের নির্যাতন করার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এভাবেই সারা দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা। পটিয়া ও রামুর সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

মহানবী (সা.)-কে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিক্রিয়ায় সারা বিশ্বে যখন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে অবস্থায় ৯০ শতাংশ মুসলমানের আবাসস্থল, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক তরুণের ফেসবুকে আল্লাহ, কাবা শরিফ এবং কোরআন অবমাননাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। উত্তম কুমার বড়ুয়া নামের ওই তরুণ তার ধৃষ্টতার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটা বুঝতে পারেনি, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হওয়ার পর কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর কর্তৃক প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে ত্বরিত দোষারোপ করায় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য তার উপরিউক্ত মন্তব্য প্রদানের পর ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত না হতেই তিনি বায়বীয় মৌলবাদ এবং অসহায় রোহিঙ্গাদের ওপর এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক হামলার দায় চাপানোর চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের উপাসনালয় এবং বাড়িঘরে প্রায় সারা রাত ধরে আক্রমণ চালানো হলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নীরবতা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। স্থানীয় পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারি দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং মৎস্যজীবী লীগের নেতাকর্মীরাই মূলত এই তাণ্ডব চালিয়েছে।

পৌনে চার বছরের মহাজোট সরকারের শাসন পদ্ধতি, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অভিন্ন রাজনৈতিক কৌশলের অংশ বলেই সচেতন নাগরিকদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে কটূক্তি করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অনেক নাগরিকের বিরুদ্ধে রাতারাতি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দেয়া হয়েছে। অথচ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক তরুণের চরম উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের আগেই দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য সরকার বিরোধী দলকে দায়ী করে যেভাবে বিবৃতি দিয়েছে, তাতে সরকারের ভূমিকাই অধিকতর প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

বিএনপির কোনো রাজনীতিবিদ যদি এ ঘটনার জন্য প্রকৃতই দায়ী হয়ে থাকেন, তাহলে সরকারের কর্তব্য হচ্ছে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ জাতিকে জানিয়ে সেই ব্যক্তিকে সময়ক্ষেপণ ব্যতিরেকে আইনের হাতে সোপর্দ করা। কিন্তু তথ্যপ্রমাণবিহীন ঢালাও রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে সহিংসতা রোধে ব্যর্থতায় সরকারের দায়িত্ব এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ইতোমধ্যে ঘটনাকে ঘৃণ্য আখ্যায়িত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। বিএনপি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করার পাশাপাশি সত্য উদঘাটনে দলীয়ভাবে আট সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে। অনেকদিন পর এই একটি ইস্যু নিয়ে অন্তত দেশের প্রধান বিরোধী দল সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ গর্ব করার মতো ঐতিহ্যের অধিকারী। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৬৪ সালে মোনায়েম খান এবং ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের সরকার রাজনৈতিক ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সাধনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করলে এদেশের প্রতিটি নাগরিক দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঙ্গাকারীদের প্রতিরোধ করেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নাগরিকরা সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার ভোগ করে এসেছেন। লেখাপড়া কিংবা সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিতে ধর্মের কারণে কোনো নাগরিকের সুযোগ কখনও সংকুচিত করা হয়নি। সরকারের অনেক উচ্চপদে সংখ্যালঘুরা চাকরি করেছেন এবং করছেন। আমাদের প্রতিবেশী প্রায় সব রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা নানারকম নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে বরাবর আমরা বাংলাদেশের উল্টো চিত্র দেখে এসেছি। মুসলমানবিরোধী দাঙ্গা সেদেশে সাংবৎসরিক ঘটনা। কয়েক বছর পরপর ভারতে খ্রিস্টানরাও সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আক্রমণের শিকার হয়ে থাকেন। প্রধান বিচারপতি আলতামাস কবীরের মতো বিচ্ছিন্ন কয়েকজন সংখ্যালঘু ভারতে উচ্চপদে আসীন হলেও সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের অবস্থা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের চেয়েও নিকৃষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি চারজনে একজন মুসলমান হলেও সরকারি চাকরিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব শতকরা তিন ভাগেরও কম। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা বরাবরই নিগৃহীত। মিয়ানমারে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনে সামরিক জান্তা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী, শান্তিতে নোবেলপ্রাপ্ত অং সাং সুচির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। রামু ও পটিয়ার চরম নিন্দনীয় ঘটনা আমাদের অতি গর্বের সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আঘাত করেছে। যে বৌদ্ধ তরুণ ঘটনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে এবং যে মুসলমানরা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সহিংসতাকে বেছে নিয়েছে, তাদের খুঁজে বের করে ভেতরের রহস্য উদঘাটন করতে হবে।

২০০৫ সালে ইসলামের নামে হঠকারী সংগঠন জেএমবি দেশব্যাপী যে বোমা হামলা সংঘটিত করেছিল, তার পেছনে দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সংযোগ ছিল বলে জনগণ দৃঢ়ভাবে সন্দেহ পোষণ করে। একইভাবে এবারের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উস্কানিতেও একই গোষ্ঠীর হাত থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বৌদ্ধধর্মীয় নেতা শুদ্ধানন্দ মহাথেরো এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। হাজার বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। এটি অঘটন নয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।'

১৯৯১ সাল থেকে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ধারা অব্যাহত আছে, সেটি পঞ্চদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করার মাধ্যমে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার অধীনেই পরবর্তী নির্বাচন সম্পন্ন করার অন্যায় ও অযৌক্তিক জিদ ধরে বসে আছেন। বর্তমান নির্বাচন কমিশন বজায় রেখে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তার রূপটি কেমন হতে পারে, সেটি গাজীপুর-৪ আসনের সাম্প্রতিক নির্বাচনেই দেশবাসী বুঝে ফেলেছে। চাচা-ভাতিজির নিতান্তই পারিবারিক নির্বাচনটাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকেনি।

এই অভিজ্ঞতার পর বিএনপির অন্তর্বতীকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবি জনগণের কাছে আরও ন্যায্যতা পেয়েছে। এই বাস্তবতায় শেখ হাসিনার একতরফা নির্বাচন একমাত্র ভারত ছাড়া বিশ্বের আর কোনো রাষ্ট্রেরই মেনে নেয়ার কথা নয়। তাই বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করতেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্যোগ নেয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। এটা যদি দেশি বা বিদেশি কোনো ফাঁদ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা যাতে সেই ফাঁদে পা না দিই, সে ব্যাপারে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আবেদন জানাই। এ ধরনের উস্কানিমূলক ঘটনা আবারও ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হলে, তার প্রতিবাদ হতে পারে। তবে সেটি অবশ্যই শান্তিপূর্ণভাবে হতে হবে। সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়ে যারা ভাংচুর চালিয়েছেন, তারা

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে দ্রুত সাজা দেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

তবে সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু মিডিয়ার উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা লক্ষ্য করে শঙ্কিত হচ্ছি। মৌলবাদের নামে আলেমদের কিংবা স্বদেশে সংখ্যাগুরু শাসকদের হাতে নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বলির পাঁঠা বানানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সব সচেতন অসাম্প্রদায়িক নাগরিকের কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। যেসব মিডিয়া কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই রামুর ঘটনায় রোহিঙ্গাদের দোষারোপ করছেন, তারা মিয়ানমারে যখন অসহায় মুসলমান সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন নীরবই ছিলেন। বিশ্বে মুসলমান জনগোষ্ঠী নিগৃহীত হলে যে শ্রেণী চুপ করে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে অথবা দুঃখবোধ করে না, তারাও অবশ্যই ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। এদের মন্দ উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রা.) একটি কাহিনী বর্ণনা করে এই মন্তব্য প্রতিবেদন সমাপ্ত করব।

মুসলমান বাহিনীর জেরুজালেম বিজয়ের পর খলিফা ওমর (রা.) সুদূর মদিনা থেকে সেখানে ভ্রমণ করেছিলেন। ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমান-তিন ধর্মাবলম্বীদের কাছেই জেরুজালেম অত্যন্ত পবিত্র নগরী। তিনি সেখানে পৌঁছানোর পর হজরত ঈসা (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত একটি গির্জা ঘুরে দেখছিলেন। এমন সময় নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে হজরত ওমর (রা.) গির্জার বাইরে এসে নামাজ পড়তে চাইলেন। গির্জার পাদ্রীরা খলিফাকে গির্জার ভেতরেই নামাজ পড়ার অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন, আমি খলিফা হয়ে আজ এখানে নামাজ পড়লে সব মুসলমানই এটাকে নামাজের স্থান বানিয়ে ফেলবে। তাতে দেখা যাবে আপনাদের গির্জা মুসলমানের মসজিদে পরিণত হয়েছে। একজন মুমিন মুসলমানের অন্য ধর্মের উপাসনালয়কে কতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য, সেদিন হজরত ওমর (রা.) আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

শুধু তা-ই নয়, খ্রিস্টান শাসকদের দীর্ঘদিনের অবহেলায় ইহুদিদের উপাসনার স্থানে যে আবর্জনার স্তূপ জমে উঠেছিল, খলিফা ওমর (রা.) সেই আবর্জনা স্বহস্তে পরিষ্কার করেছিলেন। ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এর চেয়ে মহৎ নজির বিশ্ব ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ ধর্মরক্ষার নামে যারা বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন দিয়েছে, ভাংচুর করেছে, তাদের আর যা-ই হোক, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত অনুসারী বলা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন পন্থায় ও কৌশলে আগ্রাসন চালাচ্ছে। দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়া হলে বাংলাদেশে কাছের ও দূরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন পরিচালনার নতুন ছল-ছুতা সৃষ্টি হবে। ইরাক, আফগানিস্তান এবং লিবিয়ার ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের এদেশীয় দালাল শ্রেণীকে প্রতিরোধ করে দেশপ্রেম ও প্রকৃত ঈমানের পরিচয় দেয়ার আহ্বান জানাই।

মাহমুদুর রহমান, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ।

তথ্যসূত্র: গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন কাশবন প্রকাশন, ঢাকা। প্রথম প্রকাশফেব্রুয়ারি-২০১৩

অতিথি কলাম

ভারতীয় আগ্রাসন ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা

মুসা আল হাফিজ

বাংলাদেশ এক জটিল ভূরাজনৈতিক চক্রব্যূহে অবস্থান করছে। ভারতীয় আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় নিরাপত্তা শুধু সামরিক বিষয় নয়, এটি কৌশলগত স্বার্থ, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, তথ্য ও নাগরিক চেতনার সমন্বিত একটি ক্ষেত্র। আমরা এখানে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদা সমুন্নত করে এমন একটি বাস্তবসম্মত নিরাপত্তা রূপরেখা প্রস্তাব করব।

১. নিরাপত্তা কাঠামোর পূর্ণ সংস্কার

ক. জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। এটি হবে আনুষ্ঠানিক নীতিপত্র, যেখানে রাষ্ট্রের সামগ্রিক নিরাপত্তা দর্শন সংজ্ঞায়িত হবে। নিরাপত্তা অগ্রাধিকার, কৌশল ও হুমকির বিশ্লেষণ থাকবে। এই নীতিমালা সামরিক নিরাপত্তার নীতি হাজির করবে। একই সাথে সাইবার, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সামগ্রিক কাঠামো উপস্থাপন করবে। এটি এ জন্য জরুরি যে, বাংলাদেশ এখনো অ্যাডহক ভিত্তিতে নিরাপত্তা ইস্যু সামলায়। এখানে কোনো Threat Matrix নেই, যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে- কে বন্ধু, কে হুমকি ইত্যাদি। এমন একটি স্পর্শকাতর ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, যা আরো বিভ্রান্তি তৈরি করে।

বস্তুত জাতীয় স্বার্থ নির্ধারণে একটি core doctrine থাকা জরুরি, যাতে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। কী থাকবে এই নীতিমালায়? থাকবে- ক. ভারতীয় পানি-নির্ভরতা, সীমান্ত হত্যা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রভাবের দিকগুলো। খ. ভূখণ্ডের অখণ্ডতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মতো বিষয়। গ. হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার মোকাবেলায় সামরিক ও অ-সামরিক উপায়। ঘ. প্রতিরক্ষা সক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা- সেনা, বিমান, নৌ ও সাইবার শক্তির অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য।

কারা এটি প্রণয়ন করবে? এটি প্রণয়ন করবে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল- এনএসসি। কিন্তু মুশকিল হলো, এই কাউন্সিল এখনো কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঙ. আঞ্চলিক ভারসাম্যে কৌশলগত মিত্রতা : চীন, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ইরান ও মুসলিম বিশ্ব : ভারতের একতরফা ভূ-আগ্রাসন রুখতে বাংলাদেশকে Counterweight Alliances তৈরি করতে হবে। যারা একই সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। চীন ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী, BCIM করিডোরের মাধ্যমে সে এখানকার বাস্তবতায় কৌশলগত প্রভাব রাখে। মালয়েশিয়া গণতন্ত্র ও প্রযুক্তির ভালো মডেল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। তার প্রাসঙ্গিকতা এখানেও কাজ করবে। তুরস্ক প্রতিরক্ষা শিল্পে উদীয়মান শক্তি; বাংলাদেশের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। ইরান ভারত-আমেরিকা জোটের বাইরে থাকা একটি বলিষ্ঠ আঞ্চলিক শক্তি। তার সক্ষমতা বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে। আন্তর্জাতিক জনমত তৈরিতে মুসলিম জাহান আমাদের কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম।

কীভাবে এই মিত্রতা গড়া সম্ভব? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। মিত্রতা তৈরি হবে প্রথমত, সামরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে। যৌথ প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ক্রয়, সামরিক প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রক্রিয়ায়। চীনের সাথে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক করিডোরের মধ্য দিয়ে। চীন-মালয়েশিয়ার সাথে Special Economic Zone গড়া যায়, রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প হতে পারে।

তৃতীয়ত, কূটনৈতিক ফোরাম। UNI OIC-এ একসাথে অবস্থান ও লবিং। ব্রিকসের মতো জোটে জায়গা করে নিতে হবে। আসিয়ানে যুক্ত থাকার উপায় বের করতে হবে।

চতুর্থত, মানবিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

২. জল-কূটনীতিতে আক্রমণাত্মক উদ্যোগ

ক. UN Watercourses Convention-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ : আন্তর্জাতিক নৌ-পথের নন-নেভিগেশনাল ব্যবহারের উপর **১৯৯৭** সালের জাতিসঙ্ঘ সনদ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় 'ন্যায্য ও যৌক্তিক বণ্টন' দাবি করে। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এই কনভেনশনের আইনে আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের নদী-নিয়ন্ত্রণনীতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। চুক্তিভিত্তিক আন্তর্জাতিক আপিল ও Water Sharing Dispute Tribunal-এ মামলা দায়ের করতে পারে। এতে ভারতের একতরফা প্রকল্পগুলো আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। একই সাথে নদী ইস্যুকে মানবিক-পরিবেশগত বিপর্যয়ের বিষয় হিসেবে তুলে ধরা যাবে।

খ. সার্কে মাল্টিলেটারাল চ্যালেঞ্জিং ফ্রেমওয়ার্ক : ভারত দীর্ঘদিন ধরে সার্ককে অকেজো করে রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশ-পাকিস্তান-নেপাল-ভুটান সম্মিলিতভাবে ভারতের জল-দখলনীতির বিরুদ্ধে কনসোর্টিয়াম তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশ পানিবণ্টন ইস্যুকে আঞ্চলিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। সার্ক ওয়াটার কাউন্সিল গঠনের আহ্বান জানাতে পারে। সব দেশ মিলে Equitable River Sharing Protocol গ্রহণ করে ভারতের unilateral action-এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান নিতে পারে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় একচেটিয়া মাতব্বরি প্রশ্নবিদ্ধ হবে। নেপাল-ভুটানও সাহস পাবে নিজেদের নদী ইস্যুতে কথা বলতে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা গোষ্ঠী দক্ষিণ এশিয়ার পানি সঙ্কটে ভারসাম্যহীনতাকে গুরুত্ব দেবে।

৩. সীমানা সুরক্ষা ও নীতিগত প্রতিরোধ

ক. সীমান্তে টেকসই টেকনোলজিক্যাল মনিটরিং জরুরি। শুধু বাহিনীর উপস্থিতি সীমান্ত সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর Surveillance Warfare একালে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চার হাজার **৯৬** কিলোমিটার দীর্ঘ। এখানে **২০০০** সালের পর থেকেই ভারতের নজরদারি ড্রোন, থার্মাল ক্যামেরা, সেন্সর এবং জিও-ট্র্যাকিং ব্যবস্থার আধিপত্য চলছে। অথচ বাংলাদেশ প্রথাগত নিরাপত্তা পদ্ধতিতে আটকে আছে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের করণীয় কী? প্রথমত, ইলেকট্রনিক বর্ডার সিকিউরিটি সিস্টেম (ইবিএসএস) গড়ে তোলা, যা হবে থার্মাল ইমেজিং, নাইট ভিশন ও মুভমেন্ট ডিটেকশন প্রযুক্তিনির্ভর। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বর্ডার কিলিংয়ের ভিডিও প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য সীমান্তে দিক-নির্দেশিত ক্যামেরা ও ক্লাউড বেজড স্টোরেজ। তৃতীয়ত, আধুনিক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা সীমান্তে প্রবেশ, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও অবৈধ কার্যকলাপ শনাক্ত, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়।

খ. বিএসএফের প্রতিটি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় 'অ্যাক্টিভ ডিজিটাল প্রোটেস্ট' জরুরি। প্রয়োজন ডিজিটাল ডিপ্লোম্যাসি ও মিডিয়া অ্যাক্টিভিজম। এ ক্ষেত্রে যা করণীয়, তার মধ্যে

আছে– প্রথমত, বিএসএফ কিলিং ডাটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ ও প্রচার। প্রতিটি হত্যার তথ্য, ছবি, ভিডিও ও ভুক্তভোগীর পরিচয় সংরক্ষণ করে বহুভাষিক অনলাইন রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

দ্বিতীয়ত, Real-Time Global Tweetstorm; বিশ্বজুড়ে একই সময়েই, কোনো একটি নির্দিষ্ট ইস্যু, হ্যাশট্যাগ বা বার্তা নিয়ে একসাথে বিপুল পরিমাণে টুইট ছড়িয়ে দেয়া, যেন তা ভাইরাল হয় এবং বিশ্বব্যাপী নজর কাড়ে। প্রতিটি ঘটনার পর নির্দিষ্ট ##Hashtag I coordinated influencer campaign-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা।

তৃতীয়ত, AI-based Narrative Tracker. এ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর সফটওয়্যার বা সিস্টেম, যা অনলাইন, মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কোনো নির্দিষ্ট ন্যারেটিভকে তদন্ত করতে পারে। ন্যারেটিভের গঠন, গতিপ্রবাহ, প্রভাব এবং ছড়ানোর ধরনকে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত, বিশ্লেষণ ও ট্র্যাক করতে পারে। এর মাধ্যমে ভারতীয় মিডিয়ার তথ্যপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে প্রচারযুদ্ধ রুখে দেয়া যাবে।

গ. ভারতীয় অনুপ্রবেশ ও হত্যা ইস্যুতে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মামলা। প্রথমত, International Covenant on Civil and Political Rights-(ICCPR) এ বিষয়ে আইনি কাঠামো দেয়। এর ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জেনেভা কনভেনশন-**১৯৪৯** এর আইনি অবকাঠামোকে পথ দেখাবে। জেনেভা কনভেনশন হচ্ছে যুদ্ধকালীন সময়ে আহত, অসুস্থ, যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা ও মানবিক আচরণ নিশ্চিতের জন্য গৃহীত আন্তর্জাতিক সনদ। তৃতীয়ত, জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন বা Universal Periodic Review (UPR)। যা আমাদের আইনি লড়াইকে সহায়তা দেবে। এসব আন্তর্জাতিক আইন ও বৈশ্বিক চুক্তিপত্রের সহায়তা কীভাবে নেবে বাংলাদেশ? প্রথমত, প্রত্যেক বিএসএফ হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের জন্য জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে 'Individual Communication' জমা দেয়া। দ্বিতীয়ত, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে ভারতের 'PatternofAbuse' বা অবিচার বা নিপীড়নের ধারাবাহিক চিত্র জমা দেয়া ও প্রাথমিক আবেদন জানানো। তৃতীয়ত, ওআইসি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কাছে পূর্ণ ডকুমেন্টেড রিপোর্ট প্রদান।

এর ফলে ভারত বর্ডার হিউম্যান রাইটসের ভায়োলেটর হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত হবে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে অভ্যন্তরীণ ঐক্য গঠন সহজতর হবে।

৪. অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ও শিল্প পুনরুদ্ধার

ক. ভারতীয় কোম্পানির একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ বন্ধে অ্যান্টি-ডাম্পিং আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। ITC, Godrej, Marico, Bajaj-এর মতো ভারতীয় কোম্পানিগুলো আমাদের বাজারে ডাম্পিং করছে। তারা বাংলাদেশের বাজারে পণ্য বিক্রি করে কম দামে। যাতে স্থানীয় কোম্পানি প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারে। এর মোকাবেলায় Anti-Dumping Act প্রণয়ন করতে হবে। এ আইন সরকারকে ভারতের বিরুদ্ধে Unfair Trade Practice-এর অভিযোগ তদন্ত ও প্রয়োগের কাঠামো দেবে। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) পুনর্গঠন এবং তার তদন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি জরুরি। ডাম্পিং প্রমাণিত হলে 'কাউন্টারভেলিং ডিউটি' আরোপ করতে হবে।

খ. স্থানীয় শিল্পে প্রণোদনা ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে রফতানি বিকল্পমুখী সম্পর্ক এবং বহুমুখী প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য বঙ্গোপসাগরীয় উদ্যোগকে অধিকতর ক্রিয়াশীল করা। এ ক্ষেত্রে ফার্মাসিউটিক্যালস, প্লাস্টিক, সিরামিক, গার্মেন্টের মতো স্থানীয় শিল্পে সহজ ঋণ, কর

ছাড়, রফতানি ভর্তুকি প্রদান ফলপ্রসূ হবে। ভারতনির্ভর আমদানির জায়গায় চীন, থাইল্যান্ড, তুরস্কের মতো বিকল্প উৎস সন্ধান জরুরি। বিমসটেকের মাধ্যমে বাংলাদেশ-নেপাল-শ্রীলঙ্কা-থাইল্যান্ড ট্রেড করিডোর চালু করা যেতে পারে।

এর ফলে প্রথমত, স্থানীয় শিল্প সুরক্ষা পাবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে ভারতের বাজার নির্ভরতামুক্ত ও বহুমুখী অর্থনীতিতে পরিণত হবে। তৃতীয়ত, বিমসটেককে সার্কের তুলনায় একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা যাবে, যেখানে ভারত একক কর্তৃত্ব রাখতে পারবে না। সীমান্ত ও বাজার একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। বাংলাদেশ যদি তার সীমানা রক্ষা করতে চায় এবং বাজারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়, তাহলে তাকে কেবল প্রতিক্রিয়ায় সীমায়িত হলে চলবে না, প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও প্রতিস্পর্ধার কৌশলে অভ্যস্ত হতে হবে। এই প্রস্তাবগুলো শুধু তত্ত্বগত নয়; বরং একটি আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্রের বাস্তব কর্মপন্থার ফর্মুলা।

৫. সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা ও নাগরিক প্রতিরোধ

ক. ভারতীয় চ্যানেল নিয়ন্ত্রণে কনটেন্ট কোটানীতি চালু করা দরকার : কনটেন্ট কোটা পলিসি হলো এমন একটি আইন বা নীতিমালা, যার মাধ্যমে দেশের মিডিয়া চ্যানেলগুলোতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় কনটেন্ট প্রচার বাধ্যতামূলক করা হয়। এটি তো সত্য যে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চরিত্র ক্রমে দুর্বল হচ্ছে। স্টার জলসা, জি বাংলা ইত্যাদি চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভারতীয় নারীবাদ, পরিবারব্যবস্থা ও ভাষার কৃত্রিম মানদণ্ড রফতানি হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে এটি Soft Colonialism-এর চেহারা নিচ্ছে।

এ জন্যই বাংলাদেশকে প্রথমত, কনটেন্ট কোটা অ্যাক্ট প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সব বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও রেডিওতে সর্বনিম্ন ৭০ শতাংশ দেশীয় কনটেন্ট প্রচার বাধ্যতামূলক হবে। ফ্রান্স ও কানাডায় দেশীয় কনটেন্টের জন্য ৬০-৭০ শতাংশ কোটানীতি চালু আছে। এমনকি ভারতও তাদের সংস্কৃতি রক্ষার নামে পাকিস্তানি চ্যানেল নিষিদ্ধ করে রেখেছে। দ্বিতীয়ত, বিদেশী চ্যানেলের ডাউনলিংকে Delayed Broadcasting চালু করা, যাতে তা সরকার অনুমোদিত কনটেন্ট ফিল্টারের মধ্য দিয়ে সম্প্রচার করে। তৃতীয়ত, সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ব্রডকাস্টিং কমিশনকে একত্র করে মিডিয়া ইন্টিগ্রিটি বোর্ড গঠন।

খ. জাতীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় শিক্ষাক্রমে সংযুক্ত করা : বর্তমানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পশ্চিমা ও ভারতীয় প্রভাবের সংমিশ্রণ আছে। স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যের সাথে তার যোগাযোগ কম, বন্ধন একেবারেই দুর্বল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশী মানসিকতা গড়ে না তুললে কী ঘটবে? সবাই জানি, এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ে উঠবে সংস্কৃতি-উন্মূল! সাংস্কৃতিক শেকড়চ্যুত প্রজন্ম বিচিত্র প্রবণতার পরাধীনতার জন্য তৈরি থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমত, জাতীয় পরিচয়-বিষয়ক পাঠ্যসূচির জরুরত। যেখানে সমন্বিতভাবে পড়ানো হবে ঐতিহ্য, ভাষা, আচার, স্বাধীনতার ইতিহাস, প্রেরণার সূত্র ও ক্ষেত্র, ইসলামী সংস্কৃতি ও লোকজ জীবনধারা। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ভারতীয় আধিপত্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক প্রতারণার সুনির্দিষ্ট অধ্যায় থাকতে পারে। তৃতীয়ত, স্কুল-কলেজ পর্যায়ে কালচারাল ইন্টেলিজেন্স বা Civic-Identity Literacy নামক নতুন অধ্যায় সংযোজন করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষাকে নিছক আইন বা রাজনীতির বিষয় ভাবলে চলে না; বরং তা এক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ও নৈতিক প্রস্তুতির প্রকল্প।

৬. কৌশলগত প্রতিরক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘমেয়াদে Blue Water Navy গঠনের পরিকল্পনা দরকার। ব্লু ওয়াটার নেভি হবে বিশেষায়িত সমুদ্র-সক্ষম নৌবাহিনী। এই বাহিনী উপকূলের পাশাপাশি মহাসাগরেও কার্যক্রম চালাতে সক্ষম। যেকোনো মহাসাগরে কাজের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অধিকার করবে এই বাহিনী। এমন বাহিনী দেশের কৌশলগত উচ্চতা ও আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে অবস্থানের প্রতীকে পরিণত হয়।

অনেকেই বলতে পারেন, বাংলাদেশে এমনটি কেন দরকার? বঙ্গোপসাগর হচ্ছে একটি কৌশলগত অঞ্চল, চীন, ভারত আমেরিকার মতো বিশ্বশক্তির গেটওয়ে। ভারতের আন্দামান-নিকোবর কমান্ড ইতোমধ্যে বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য বিস্তার করেছে। ভারত লুক ইস্ট নীতি বাস্তবায়নে সক্রিয়। এর ভিত্তিতে বাংলাদেশকে কৌশলগত বন্দরে রূপান্তর করতে চাইবে তারা।

ক. এমতাবস্থায় বাংলাদেশ কী করবে? প্রথমত, ধাপে ধাপে Ocean-Going Submarines, Destroyers, Naval Air Wing গঠনের পরিকল্পনা করবে। দ্বিতীয়ত, Naval War Doctrine প্রণয়ন করবে, যা প্রতিরক্ষার পথরেখা স্পষ্ট রাখবে এবং কৌশলগত deterrence নীতির অংশ হবে। তৃতীয়ত, চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দরকে স্ট্র্যাটেজিক নেভাল বেস হিসেবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ যেন বঙ্গোপসাগরে নিরপেক্ষ ও শক্তিমান সমুদ্রশক্তি হয়ে উঠতে পারে, সে দিকে এগোতে হবে। এই সামর্থ্য ভারত, চীন বা অন্য কোনো শক্তির প্রাধান্য অর্জনে বাধা দেবে।

খ. প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও রাডার সক্ষমতা বাড়াতে চীন ও তুরস্কের সাথে যৌথ উন্নয়ন চুক্তি করা যেতে পারে। কারণ বাংলাদেশ এখনো প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে নেট ইমপোর্টার। অপর দিকে, ভারতের প্রযুক্তি-নির্ভরতা রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক।

এমতাবস্থায় প্রথমত, চীন-বাংলাদেশ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে প্রযুক্তি ট্রান্সফার হবে। দ্বিতীয়ত, তুরস্কের এসেলসান ও বাইরাক্তার কোম্পানির সাথে UAV (ড্রোন), সমুদ্রপৃষ্ঠ রাডার ও কমান্ড-সিস্টেম উন্নয়নে চুক্তি করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি (বিওএফ) পুনর্গঠন করে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেল গঠন করা যেতে পারে।

এর ফলে বাহিনীর আত্মনির্ভরতা বাড়বে। ভারত-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ একটি Multi-Vector Defence Partnership Model গড়ে তুলতে পারবে।

আজকের বাস্তবতায় প্রতিরক্ষার প্রতিটি উপাদানের দিকে নজর দেয়া জরুরি। সীমান্তের পাহারা কেবল সামরিক সক্ষমতা দিয়ে হবে না, সাংস্কৃতিক সীমান্তও বাঁচাতে হবে। আবার সামরিক সক্ষমতার অনুপস্থিতি আধিপত্যবাদের আগ্রাসনকে প্ররোচিত করবে। সংস্কৃতি ও প্রতিরক্ষা মিলেই একটি রাষ্ট্রের অদৃশ্য অথচ বাস্তব সীমান্ত। যদি রাষ্ট্র এসব সীমান্ত সচেতনভাবে নির্মাণ না করে, তবে প্রতিপক্ষ এগুলো দখল করে নেয়। বাংলাদেশের প্রয়োজন আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কৌশলগত রূপান্তর।

লেখক :মুসা আল হাফিজ, কবি, সাহিত্যিক